নবনীতা দেব সেনের (নির্বাচিত) ছোটোগল্প : নারী নির্মাণের নানা দিক

A thesis submitted towards partial fulfillment of the requirements for the degree of

M Phil in Women's Studies

Course affiliated to Faculty of Interdisciplinary Studies,
Law and Management
Jadavpur University

Submitted by

SAMPRITI BOSE

EXAMINATION ROLL NO.: **MPW0194011**

Under the guidance of

SAMPA CHOWDHURY
Professor,
Department of Bengali,
Jadavpur University

School of Women's Studies
Jadavpur University
Kolkata-700032
India

2019

M Phil in Women's Studies
Affiliated to the
Faculty of Interdisciplinary Studies, Law & Management
Jadavpur University
Kolkata, India

CERTIFICATE OF RECOMMENDATION

This is to certify that the thesis entitled **"নবনীতা দেব সেনের (নির্বাচিত) ছোটোগল্প : নারী নির্মাণের নানা দিক"** is bonafide work carried out by **SAMPRITI BOSE** under our supervision and guidance for partial fulfillment of the requirement for M Phil in Women's Studies during the Academic Session 2019.

THESIS ADVISOR
Sampa Chowdhury
Department of Bengali
Jadavpur University, Kolkata- 700032

DIRECTOR
Professor Aishika Chakraborty
School of Women's Studies
Jadavpur University, Kolkata- 700032

DEAN
Faculty of Interdisciplinary Studies, Law & Management
School of Water Resources Engineering
Jadavpur University, Kolkata- 700032

CERTIFICATE OF APPROVAL **

This foregoing thesis is hereby approved as a credible study of a social science/humanities subject carried out and presented in a manner satisfactorily to warranty its acceptance as a pre-requisite to the degree for which it has been submitted. It is understood that by this approval the undersigned do not endorse or approve any statement made or opinion expressed or conclusion drawn therein but approve the thesis only for purpose for which it has been submitted.

Committee

_____

Final Examination
for the evaluation
of the thesis

_____

_____

** Only in case the thesis is approved.

Declaration of Originality and Compliance of Academic Ethics

I hereby declare that this Thesis contains literature survey and original research work by the undersigned candidate, as a part of my M Phil in Women's Studies degree during academic session 2019.

All information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct.

I also declare that, as required by this rules and conduct, I have fully cited and referred all material and results that are not original to this work.

Name:	SAMPRITI BOSE
Roll Number:	MPW0194011
Thesis Title:	নবনীতা দেব সেনের (নির্বাচিত) ছোটোগল্প : নারী নির্মাণের নানা দিক

Signature:

Date:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা নিবন্ধ লেখার আগে আমি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের অধিকর্তা ড. ঐশিকা চক্রবর্তী এবং এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অধ্যাপক ও গবেষককে। তাঁদের শিক্ষায় এবং সহায়তায় সমাজকে দেখার এবং সাহিত্যকে পড়ার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রী হয়ে এই বিভাগের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। তবে বিশেষ ভাবে ঋণী বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শম্পা চৌধুরী-র কাছে। খুব জটিল পরিস্থিতিতে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক হতে সহমত হয়েছেন এবং পুরো গবেষণা প্রক্রিয়ায় তিনি আমাকে নিজের মত করে গবেষণা করার স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং সব রকম ভাবে সাহায্য করেছেন। গবেষণার বিষয় নির্বাচনে সাহায্য করেছেন শ্রীশাশ্বত ভট্টাচার্য। অধ্যাপক বরেন্দু মন্ডল গবেষণা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান মতামত জানিয়ে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক এবং কবি অঞ্জলি দাসের সহায়তায় নবনীতা দেব সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। যদিও নবনীতা দেব সেনের শারীরিক অসুস্থতার জন্যে সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়নি, তবুও এমন একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পেরে কৃতার্থ হয়েছি।

গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর দিয়ে সব রকম ভাবে সাহায্য করেছে বন্ধু সায়ন চট্টোপাধ্যায়। এবং গবেষণা নিবন্ধটি লিখতে উৎসাহিত করেছে মৌমিতা বিশ্বাস এবং অপরূপা ঘোষ। কাকলি কাকিমা (রায়) গবেষণার প্রথম দিন থেকে নবনীতা দেব সেনের বিভিন্ন বই দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন।

আর খুব কম সময়ে দায়িত্ব নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে গবেষণা অভিসন্দর্ভটি তৈরী করে দিয়েছেন শুভেন্দু তরফদার। তাই এই মানুষ গুলোকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করব না।

গবেষণার প্রয়োজনে খুব গুরুত্বপূর্ণ বই এবং পত্রিকা পেয়েছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগীয় গ্রন্থাগার থেকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আধিকারিক এবং কর্মীবৃন্দের তৎপরতায় অন্যান্য পি.এইচ.ডি এর গবেষণা অভিসন্দর্ভ দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়াও সাহিত্য আকাদেমীর লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। বাংলা সাহিত্য বিষয়ক যে কোনো গবেষণায় 'লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির' ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণপুরুষ সন্দীপ দত্ত-র পত্রিকা বিষয়ক জ্ঞান এবং অসাধারণ স্মৃতি থেকে পেয়েছি নবনীতা দেব সেনকে নিয়ে লেখা বিভিন্ন পত্রিকার সন্ধান। যা আমার গবেষণাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

শেষে বলব মা আর বোনের কথা। সব কঠিন দিন গুলোতে এই দুজন আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছে। আমায় অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়াও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যাঁরা আমায় সাহায্য করেছেন তাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

তারিখ- মে, ২০১৯ সম্প্রীতি বোস

স্থান- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমাঙ্ক-MPW0194011

কলকাতা

মুখবন্ধ

যেসকল কথাসাহিত্যিকের লেখা পড়ে বাংলা সাহিত্যকে ভালোবাসতে শিখেছি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নবনীতা দেব সেন (১৯৩৮-)। প্রথমে তাঁর লেখার সরসতা মনে দাগ কাটলেও বহুপাঠের অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে হাস্যকৌতুকের আবরণে অনেক গভীর কথা বলে দেন তিনি। যতবার তাঁর গল্পগুলো পড়েছি, ততবার নতুন কিছু আবিষ্কার করেছি। যে বিষয় নিয়েই গল্প লিখুন না কেন তাঁর লেখায় মিশেছে একটি লিঙ্গসচেতন মন। যার দ্বারা তিনি সাহিত্যে নিজেকে এবং সমাজকে প্রতি মুহূর্তে সৃজন করেছেন। কিন্তু মানবীবিদ্যাচর্চা করতে এসে নারীবাদকে বুঝতে শেখার পর তাঁর গল্পগুলো আবার নতুন ব্যঞ্জনায় ধরা দিয়েছে আমার কাছে। সমাজের নানা স্তরের মানুষের সংবেদনশীল উপস্থাপন থাকলেও তাঁর লেখার প্রাধান্য পেয়েছে নারী, নারীর অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি। সমাজে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে থাকা নারীদের তিনি নির্মাণ করেছেন সমান দক্ষতায়। শিশুকন্যা থেকে বৃদ্ধা, মহাকাব্যের নারী থেকে নবনীতা নিজে অদ্ভুত ভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন তাঁর গল্পে। এই বোঝাপড়া থেকে গবেষণা শুরু করার পর দেখা গেছে, নবনীতা দেব সেন তাঁর গল্পে নারীদের নির্মাণ করতে গিয়ে প্রশ্ন করেছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণকে, নস্যাৎ করেছেন আদর্শ মেয়ের, মায়ের এবং স্ত্রীর পূর্বনির্ধারিত লিঙ্গভূমিকাকে, কণ্ঠ দেয়েছেন সেই সব মেয়েদের লড়াইকে যাঁদের কথা না শোনা হয়ে থেকে গেছে। তৈরি করেছেন 'স্বতন্ত্র স্বর' যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বিচারিতা, বৈষম্যমূলক আচরণকে কখনও নির্মল হাস্যের সহায়তায়, কখনও বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ ফলায় বিদ্ধ করেছে। তাই এমন একজন লেখকের ছোটোগল্পে নারীর নির্মাণের নানা দিক, নানা বৈশিষ্ট্যকে বোঝাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রধান উদ্দেশ্য।

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার v – vi

মুখবন্ধ vii

ভূমিকা ১ – ৭

প্রথম অধ্যায়

জীবনের সাহিত্য, সাহিত্যের জীবন ৯ – ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাকাব্যিক নারীচরিত্রদের পুনর্নির্মাণ ২৭ - ৪৮

তৃতীয় অধ্যায়

নবনীতা দেব সেনের গল্পে সমাজ ও নারী ৫০ - ৬৫

চতুর্থ অধ্যায়

নবনীতা দেব সেনের কলমে প্রতিবাদী স্বর ৬৭ - ৮৩

উপসংহার ৮৪ – ৮৮

গ্রন্থপঞ্জি ৮৯ – ৯৫

ভূমিকা

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক হলেন নবনীতা দেব সেন (১৯৩৮–)। বাংলা সাহিত্যের এমন কোনও সংরূপ নেই যা তাঁর প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়নি। কবিতা লেখা দিয়ে যে সাহিত্যজীবনের সূচনা, তাই পরবর্তীকালে পল্লবিত হয়েছে ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণকাহিনি, অনুবাদ, রম্যরচনা, স্মৃতিসাহিত্য ইত্যাদি নানান সাহিত্য সংরূপে। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে নবনীতা দেব সেন তাঁর মেধায়, সৃষ্টিশীলতায়, বিষয়বৈচিত্র্যে এবং প্রকাশভঙ্গির প্রাচুর্যে বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন।

নবনীতা দেব সেন যখন গল্প লেখা শুরু করছেন সেই সময়কালটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্তরের দশকের শুরুতেই নকশালবাড়ি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের (১৯৭১) অবসানে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ, এসেছে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ১৯৭৭ সাল থেকে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে এবং ১৯৯১ সালে ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ হয়েছে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ধর্মের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে রাজনীতি। ফলে দ্রুত বদলেছে মানুষের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, জীবনদর্শন। যৌথ পরিবার ভেঙে গেছে। মেয়েরা অন্দরমহলে আবদ্ধ না থেকে কাজের প্রয়োজনে ‘পুরুষের কর্মজগতে’ প্রবেশ করেছেন। বাংলা সাহিত্য জগতেও অনেক মেয়েরা নিজেদের স্বতন্ত্র স্থান তৈরির লড়াই শুরু করেছেন। লীলা মজুমদার (১৯০৮-২০০৭) ছোটোদের জন্যে লিখছেন বিভিন্ন মজার কাহিনি। আশাপূর্ণা দেবীর (১৯০৯-১৯৯৫) লেখায় সমাজ ও পরিবারে নারীর অবদমন খুব ব্যাপক অথচ মৃদু উঠে আসছে। মেয়েদের মধ্যে যে রাজনৈতিক

সচেতনতা তৈরি হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সাবিত্রী রায় (১৯১৮-১৯৮৫), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬) প্রমুখের লেখায়। কবিতা সিংহের (১৯৩১-১৯৯৮) কবিতা এবং গল্পে তীব্রভাবে আক্রান্ত হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। তাঁর লেখায় যুগ যুগের মেয়েদের অভিমান বিদ্রোহের আকার নিচ্ছে। এই দ্রুত পরিবর্তিত হওয়া সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে নবনীতা দেব সেন সাহিত্য রচনা করছেন। এছাড়াও তাঁর সমসময়ে এবং একটু পরে লিখছেন বাণী বসু (১৯৩৯-), সুচিত্রা ভট্টাচার্য (১৯৫০-২০১৫), অনিতা অগ্নিহোত্রী (১৯৫৬-), তিলোত্তমা মজুমদার (১৯৬৬), যাঁদের লেখায় নারীর আত্ম-আবিষ্কারের নানা দিক স্পষ্ট হচ্ছে।

নবনীতা দেব সেন তাঁর *গল্পসমগ্র ১*-এর শুরুতে জানান, তিনি প্রথম গল্প লিখেছিলেন ১৯৫৬ বা '৫৭ সালে। যে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার' পত্রিকায়। কিন্তু সেই গল্প এবং আরো বেশ কিছু গল্প হারিয়ে গেছে। তারপর মাঝে অনেকটা সময়ের ব্যবধানে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *মঁসিয়ো হুলোর হলিডে*। এই বইয়ের গল্পগুলি প্রধানত লেখা হয়েছে ১৯৭৪ সালের পর থেকে। তাঁর গল্পসমগ্রের শেষ অর্থাৎ চতুর্থ খণ্ডের সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ *রাগ-অনুরাগ ও অন্যান্য* প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে। সুতরাং প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকে শেষ গল্পগ্রন্থের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় তিরিশ বছর। এই তিরিশ বছরে নবনীতার প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা মোট এগারো এবং সেখানে সংকলিত গল্পের সংখ্যা একশো সাত। এই চারটি খন্ডে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থই এই গবেষণার আকর গ্রন্থ। তবে এই গল্পগুলোর পাশাপাশি নবনীতা দেব সেন আরো ছোটোগল্প লিখছেন। ছোটদের জন্যে লেখা গল্প নিয়ে দুখন্ডে প্রকাশিত হয়েছে *ছোটদের গল্পসমগ্র*। *উপমহাদেশের গল্প* নামক গ্রন্থে ভারতের নানা ভাষায় লেখা

ছোটোগল্পের অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও এখনও তাঁর সচল কলম লিখে চলেছে বিভিন্ন অণুগল্প যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তবে গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।

এতগুলো সাহিত্য সংরূপে যিনি সাহিত্য রচনা করছেন তাঁর মধ্যে থেকে ছোটোগল্পকে বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ হল- নবনীতা দেব সেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাহিত্যের নানা সংরূপে লিখলেও ভ্রমণ কাহিনি, শিশুসাহিত্য, রম্যরচনা, জীবনী, আত্মজীবনীর, পত্রসাহিত্য, স্কেচ সব কিছুর নির্যাস পাওয়া যায় তাঁর ছোটোগল্পে। বিষয়ের দিক থেকেও তাঁর ছোটোগল্প বৈচিত্র্যপূর্ণ। মহাকাব্যর নারীদের নিয়ে যেমন লিখছেন তেমনই লিখছেন নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিয়ে। নবনীতা নিজে সেই সময় একজন নারী হয়ে নিজের অর্জিত অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে দেখতে চাইছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের জীবনকে, তাঁদের জীবনের পরিবর্তনের স্বরূপকে বুঝতে চেষ্টা করছেন। সমাজের লিঙ্গ নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন, সজাগ নবনীতা তাঁর লেখা ছোটোগল্পে কখনও হাস্যপরিহাসের ছলে বা কখনও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ম ফলায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনা করছেন নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর যে আঙ্গিকেই যে বিষয় নিয়েই লিখুন না কেন তার একটা প্রধান অংশ জুড়ে থাকছে নারীকেন্দ্রিকতা।এমনকি গল্প বলার কৌশলের মধ্যেও নারী কণ্ঠের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কখনও নিজেই নিজের জীবনের কথক হয়ে, কখনও কোনো নারী চরিত্রকে কথক করে গল্প লিখেছেন। আবার সর্বজ্ঞ কথকের সাহায্যে গল্প বললেও সেই কথক অর্জন করছেন নারীর দৃষ্টিভঙ্গি। নারী চরিত্র নির্মাণের এর বৈচিত্র্য, গভীরতা এবং ব্যাপ্তি থাকা নবনীতা দেব সেনের গল্পে নারীর নির্মাণের স্বরূপকে বোঝাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের অন্বিষ্ট।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে প্রধানত যে প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা হয়েছে, সেগুলি হল —

- নবনীতা দেব সেনের ছোটোগল্পে নারীর নির্মাণ কেন প্রাধান্য পেয়েছে।
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর নারীচরিত্রগুলি কীভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
- একুশ শতকে দাঁড়িয়ে মহাকাব্যের নারীচরিত্রের পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন কতটা।
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ত্রুটিগুলি 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' হয়ে দেখানোর ক্ষেত্রে 'ভিন্ন স্বর' তৈরি করা কতটা প্রয়োজনীয়।
- নবনীতা দেব সেনের গল্পে নারীবাদের প্রভাব কতটা ।

'৭০-এর দশকের পরবর্তী সময়ে নারীবাদ তাত্ত্বিক পরিকাঠামো লাভ করলে সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন দিক উন্মোচিত হয়। প্রথাগত সাহিত্য-সমালোচনা থেকে নারীবাদী সাহিত্য-সমালোচনা আলাদা হয়ে যায় কারণ এখানে আত্মবাদিতাকে (Subjectivity) নৈর্ব্যক্তিকতার (Objectivity) তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গী, অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় যে কোনো সাহিত্যকে। এই অভিসন্ধর্ভে প্রধানত নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নবনীতা দেব সেনের ছোটোগল্পকে পড়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতিবিদ্যায় (Qualitative Methodology) গবেষণা করার জন্য যে পদ্ধতি (Method)-র সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তা হল আধার বিশ্লেষণ (Content Analysis)।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চারটি অধ্যায়ের মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য থাকেলও যে মূলভাব (theme) এই চারটি অধ্যায়কে এক সূত্রে গেঁথেছে তা হল নারীর নির্মাণ। সব কটি অধ্যায়েই ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে থাকা নারীর নির্মাণের স্বরূপকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে ।

প্রথম অধ্যায়, **'জীবনের সাহিত্য, সাহিত্যের জীবন'**-এ সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেনের জীবনের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর ছোটোগল্পগুলিকে। কারণ তাঁর লেখা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর জীবন নিবিড়ভাবে জড়িত। ছোটোগল্পগুলিতে তিনি নিজেকে নিয়ে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এমনভাবে লিখেছেন, যা ব্যক্তি নবনীতাকে জানার নির্ভরযোগ্য দলিল। ছোটোগল্পগুলিতে নবনীতা সম্বন্ধে তথ্যের পাশাপাশি পাওয়া যায় সাহিত্যিক নবনীতার হাতে ব্যক্তি নবনীতার নির্মাণ। এই অধ্যায়ে খোঁজার এবং বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে নবনীতা দেব সেন সাহিত্যিক পরিসরে কীভাবে নিজেকে নির্মাণ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়, **'মহাকাব্যিক নারীচরিত্রদের পুনর্নির্মাণ'**-এ রামায়ণ এবং মহাভারতের নির্বাচিত কিছু নারীচরিত্র, যেমন, সীতা, ঊর্মিলা, শূর্পনখা থেকে সত্যবতী, গঙ্গা, অম্বা, কুন্তির পুনর্নির্মাণ নবনীতা দেব সেন কীভাবে করেছেন তা দেখা হয়েছে। ধ্রুপদি মহাকাব্যের মূল গল্প এবং ঘটনা পরম্পরাকে এক রেখে কখনো বা কল্পিত ঘটনার অবতারণা করে এই নারীচরিত্রগুলির অশ্রুত কণ্ঠস্বর, নিঃশব্দ প্রশ্নকে তিনি পুনরুত্থিত করেছেন। মহাকাব্যের এই নারীচরিত্রগুলির পুনর্নির্মাণের মধ্যে মিশে আছে তাঁর রামায়ণ বিষয়ে গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং লিঙ্গবৈষম্য সম্বন্ধে সচেতন সংবেদনশীল একটা মন। নবনীতা দেব সেন মহাকাব্যের নারীদের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন, তার সঙ্গে মহাকাব্যের বিকল্প পাঠের সম্ভাবনাকে বলিষ্ঠ করেছেন। এই অধ্যায়ে দেখা হয়েছে হাস্য-পরিহাসের ছলে নবনীতা দেব সেন কীভাবে মহাকাব্যের নারীচরিত্রদের পুনর্নির্মাণ করে মহাকাব্য পাঠের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিচ্ছেন।

তৃতীয় অধ্যায়, **'নবনীতা দেব সেনের গল্পে সমাজ ও নারী'**-এ নবনীতা দেব সেন তাঁর গল্পে প্রায় তিরিশ বছরের পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুকন্যা হত্যা, লিঙ্গবৈষম্য, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ইত্যাদি নানা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নারীচরিত্রদের নির্মাণ করেছেন।

শুধুমাত্র 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' হিসেবে নারীর একার নয়, তৃতীয় লিঙ্গের সমস্যাগুলিকেও নারীদের সমস্যার সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। যেহেতু প্রায় তিরিশ বছর ধরে লিখছেন সেহেতু সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবনীতার বিষয় নির্বাচনে এবং সেই নিয়ে গল্প লেখার ধরণেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নবনীতা তাঁর গল্পের মাধ্যমে শুধু সত্যিটা তুলে ধরছেন না, তার সঙ্গে নারী চরিত্রগুলো নির্মাণের মধ্যেমে সমাজে প্রচলিত ধারণা গুলোকে ভুল প্রমাণ করে বিকল্প যুক্তিযুক্ত সম্ভবনা তৈরি করেন।

চতুর্থ অধ্যায়, **'নবনীতা দেব সেনের কলমে প্রতিবাদী স্বর'**-এ প্রধানত দেখা হয়েছে নবনীতা দেব সেন তাঁর লেখনীকে কীভাবে ব্যবহার করছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনার জন্য। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিবাদ এক-একজন সাহিত্যিক এক-একভাবে করেছেন। নবনীতা তার প্রতিবাদ করেছেন প্রধানত 'ভিন্ন স্বর' তৈরির মাধ্যমে। নবনীতার এই ভিন্ন স্বরে মিশে আছে ব্যক্তি হিসেবে তাঁর নানা বৈশিষ্ট্য, যা তাঁর লেখাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। তিনি হাসির বিভিন্ন উপাদান ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপকে ব্যবহার করেছেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভুলগুলিকে তুলে ধরার জন্য। এই অধ্যায়ে প্রধানত দেখা হয়েছে নবনীতা নিজের 'স্বতন্ত্র স্বর'-কে কীভাবে ব্যবহার করছেন সমাজের লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য।

নবনীতা দেব সেনের নারীচেতনার স্বরূপ বুঝতে গেলে তাঁর লেখা সাহিত্যের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষন করা দরকার। কিন্তু স্বল্প সময়ে গবেষণাটি করার জন্য ছোটোগ সংরূপটির মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এবং গবেষণার বিষয় এবং অধ্যায়ের মূলভাব (theme) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় এবং প্রতিনিধিস্থানীয় ছোটোগল্পগুলিকে নিয়েই শুধুমাত্র আলোচনা করা হয়েছে। বাদ দিতে হয়েছে বেশ কিছু গল্পগ্রন্থের গল্প। তাছাড়াও আলোচনায়

এমন অনেক গল্প আছে যেগুলোর প্রকাশকাল পাওয়া যায় না। তাই সেইগুলোর ক্ষেত্রে গল্পের নামের পাশে প্রকাশকাল উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। নবনীতা দেব সেন তাঁর গল্পে যে বানান লিখেছেন তা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। নবনীতা দেব সেনের একটি সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য।

প্রথম অধ্যায়

জীবনের সাহিত্য, সাহিত্যের জীবন

ডাকাবুকো এক মেয়ে

সক্কলে চমকায়

কখন সে ভালোবাসে

কখন সে ধমকায়

ক্লাসরুমে দিদিমণি

মারুতিতে ড্রাইভার

টো টো সারা দুনিয়ায়

কিছু নেই চাইবার

বক্তৃতা কৌতুকে

কবিতায় শ্যাম্পেন

বাংলার সেরা মেয়ে

নবনীতা দেব সেন।[১]

বিশিষ্ট নারীবাদী কবি, অধ্যাপক, সমাজতাত্ত্বিক মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর এই ছোটো কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ কবিতায় নবনীতা দেব সেনকে বলেছেন 'বাংলার সেরা মেয়ে'। যদিও সেরার সংজ্ঞা আপেক্ষিক, তবুও তাঁর জীবনের নানা তথ্য এবং সেই তথ্যের বিশ্লেষণের মধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে সেই সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে যা তাঁর জীবনকে এবং যাপনকে আসামান্য করে তোলে। এই উত্তর খুঁজতে গেলে নানা তথ্যের পাশাপাশি জানতে হবে ব্যক্তি নবনীতা দেব সেনকে। আর কোনো লেখককে জানার একটি নির্ভরযোগ্য উপাদান হল তাঁর আত্মজীবনী। নবনীতা দেব সেন আত্মজীবনী না লিখলেও নিজের জীবনের নানা মুহূর্তেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন

সাহিত্যের বিভিন্ন সংরূপে; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁর নিজেকে নিয়ে লেখা ছোটগল্প। যেগুলিকে 'আত্মজৈবনিক ছোটোগল্প'-ও বলা যেতে পারে। রাসসুন্দরী দেবী-র (১৮০৯-১৮৯০) *আমার জীবন* থেকে বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী লেখার ধারা প্রবাহিত হলেও 'আত্মজৈবনিক ছোটগল্প' বাংলা সাহিত্যে প্রায় বিরল। এই গল্পগুলোকে আত্মজীবনীর মাপকাঠিতে যেমন ঠিক ভাবে বিচার করা যাবে না ঠিক তেমনই ছোটোগল্পের সংরূপগত বৈশিষ্ট্য দিয়েও এই গল্পগুলোকে বাঁধা সম্ভব নয়। তাই এই দুটো বিষয়কে জেনেই নবনীতা দেব সেনের নিজেকে নিয়ে লেখা গল্পগুলো পড়লে দেখা যায় সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেনের সরস রচনাভঙ্গিতে ব্যক্তি নবনীতা দেব সেন কী ভাবে নির্মিত হচ্ছেন।

তবে এক্ষেত্রে একটি অব্যর্থ প্রশ্ন হল- কী করে বোঝা যাবে নবনীতা দেব সেন নিজেকে নিয়ে যে গল্পগুলো লিখছেন সেগুলো সব সত্য? তথ্যের সঙ্গে বিচার করেও একথা স্বীকার করতেই হয়, যে স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা থেকে তিনি গল্প লিখছেন সেই স্মৃতি আসলে স্বনির্বাচিত এবং সেই অভিজ্ঞতা সমাজ দ্বারা নির্মিত। তাই এই প্রশ্নের উত্তর নবনীতা নিজেই দিচ্ছেন 'ডক্টর দেব সেনের বিদেশ যাত্রা' নামক গল্পের শেষে। নবনীতা বলছেন—"এখানে বর্ণিত প্রত্যেকটি ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, প্রতি ক্ষেত্রেই বহু সাক্ষী বর্তমান আছেন, যদিও, তাঁরা না-থাকলেই বেশি ভালো হতো!"[২] এই একই কথা 'অপারেশন ম্যাটারহর্ণ' গল্পতেও পাওয়া যায়। যদি লেখক হিসেবে গল্প লিখে নবনীতা দেব সেন নিজেই দাবী করেন সেই সব ঘটনা 'সর্বৈব সত্য'[৩] তাহলে একজন নারীবাদী গবেষক হয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাকে সম্মান জানিয়ে, সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেনের কলমে ব্যক্তি নবনীতা দেব সেনের নির্মাণকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

নবনীতা দেব সেন যে পরিবেশে এবং যে শিক্ষায় বড় হয়েছেন তা তাকে অনেকটা সুযোগ দিয়েছে গড়ে উঠতে এবং নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করতে। কারণ বাংলার দুই কবি দম্পতি নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১) এবং রাধারাণী দেবীর (১৯০৩-৮৯) একমাত্র সন্তান নবনীতা। তাঁর জন্ম ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। 'নবনীত' কথাটির অর্থ হল ননি[৪], তার স্ত্রীলিঙ্গ হল 'নবনীতা'। নবনীতা নামটি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) দেওয়া এই তথ্যটি হয়তো অনেকেরই জানা কিন্তু এই নামের একটা ইতিহাস আছে; যা রাধারণী দেবীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও এক নতুন তথ্য দেয়। বালবিধবা রাধারাণী দেবীর দ্বিতীয় বিবাহ (১৯৩১) যখন হয় মুক্তমনা এবং সংস্কারহীন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাধারাণী দেবীকে নতুন নাম দেন 'নবনীতা'; মানে 'নতুন করে বিবাহিত'। কিন্তু রাধারাণী দেবী শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া সেই নাম প্রত্যাখ্যান করেন কারণ ততদিনে তাঁর প্রথম কবিতার বই *লীলাকমল* (১৯২৯) প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং রাধারাণী নামেই তিনি বাংলা সাহিত্য জগতে পরিচিত। তাই পিতৃদত্ত নামটিই রাধারাণী দেবী বজায় রাখেন। তৎকালীন সমাজে বিয়ের পর মেয়েদের নতুন নামে পরিচিত হওয়া ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা কিন্তু রাধারাণী দেবী সাধারণ মেয়ে ছিলেন না তাই সমাজে প্রচলিত প্রথাকে অস্বীকার করে এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া নামকেও প্রত্যাখ্যান করে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই জানান যে রাধারাণী নামটাই তিনি রাখবেন। নিজের আত্মপরিচয় সম্বন্ধে কতটা সচেতন হলে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। পরে তাঁর কন্যা হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম রাখেন নবনীতা।[৫]

নবনীতা দেব সেন রাধারাণী দেবীর দ্বারা যে প্রভাবিত হবেন তা খুব স্বাভাবিক। তিনি নিজেই বলেন—"সাহিত্য বীক্ষায় আমার নজর মায়ের রুচিমতে গড়ে উঠেছিল একথা বলতে

আমার গৌরববোধ হয়।"[৬] যিনি সাহিত্য জগতে মেয়েদের লেখা নিয়ে প্রচলিত হীন ধারণা ভাঙার জন্যে এবং একই সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মত সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্যে 'অপরাজিতা' ছদ্মনামে লেখেছেন গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে জগদীশ ভট্টাচার্য নারীর কলমে এমন দুঃসাহসিকতার জন্যে তাঁর প্রশংসাও করেছেন। রাধারাণী দেবী ছদ্মনাম হিসেবে 'অপরাজিতা' নামটি বাছার মাধ্যমেই বোঝা যায় তাঁর এই ছদ্মনাম গ্রহণের উদ্দেশ্য। আর এই রকম এক স্পষ্টবাদী, ব্যক্তিত্বময়ী, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং বিদূষী প্রতিভাবান মায়ের 'মাতৃয়ার্কি'-তেই নবনীতা দেব সেনের বড় হওয়া। রাধারাণী দেবীর ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য পাওয়া যায় নবনীতা দেব সেনের লেখা গল্পগুলোতে। নিজের সঙ্গে রাধারাণী দেবীকেও চরিত্র করে নবনীতা লেখেন একাধিক গল্প তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মাতৃয়ার্কি' । নবনীতা দেব সেন তাঁর *সীতা থাকে শুরু* গ্রন্থের শুরুতে জানান 'মাতৃইয়ার্কি' শব্দটিকে দুই ভাবেই ভাবা যেতে পারে। প্রথমত, 'মাতৃ+ইয়ার্কি' মানে মায়ের ইয়ার্কি আর দ্বিতীয়ত, 'patriarchy' বা 'পিতৃতন্ত্র'-এর প্রতিস্পর্ধী ধারণা হিসেবে 'matriarchy' বা 'ম্যাট্রিয়ার্কি'। এই গল্পটা বলতে গিয়ে নবনীতা দেব সেন আসলে উত্থাপন করলেন নারীবাদের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়- তা হল কেন্দ্র ও পরিধির মধ্যেকার ক্ষমতার খেলা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কেন্দ্রে থাকে পুরুষ আর নারী স্থান পায় পরিধিতে, পুরুষকে কেন্দ্র করেই নারীর জীবন এবং যাপন। কিন্তু রাধারাণী দেবীর সাম্রাজ্যে নারী ছিল পরিধি থেকে কেন্দ্রস্থিত। এই গল্পে বিভিন্ন টুকরো স্কেচের ভঙ্গিতে নবনীতা দেব সেন তুলে ধরেন রাধারাণী দেবীর নানা অজানা দিক -

> মা প্রায় কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। যখন খুশি ঘুমান, যখন খুশি জাগ্রত থাকেন, কোন বই পড়ছেন সেটা কতটা ইন্টারেস্টিং তারই উপর

নির্ভর করছে অন্যান্য জগতিক প্রয়োজন। ঘড়ির কাটাকে মা থোড়াই কেয়ার করেন। "আমি কি ঘড়িটা কিনেছি, না ঘড়িটা আমায় কিনে নিয়েছে? কে কার মালিক? সুতরাং ঘড়ি ওর ক্রীতদাস।[৭]

এমনই একজন ব্যতিক্রমী নারীকে ছোটোগল্পের চরিত্র বানিয়ে নবনীতা দেব সেন তাঁর মা সম্বন্ধে দিলেন এমন সব তথ্য যা হয়তো মেয়ে হিসেবে নবনীতা দেব সেনেই একমাত্র বলতে পারতেন। বাংলার সাহিত্য সমাজে এক মেয়ের কলমে তাঁর মা সাহিত্য জগতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেন। রাধারাণী দেবীকে নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে যা অন্যতম নির্ভরযোগ্য উৎস। একই সঙ্গে নবনীতা দেব সেন অপরাজিতা ছদ্মনামে লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প সম্পাদনা করে প্রকাশিত করলেন *অপরাজিতা রচনাবলী* (১৯৮৪) । রাধারাণী দেবীকে নিয়ে গল্প লিখে এবং তাঁর লেখা সাহিত্য সম্পাদনা করে নবনীতা দেব সেন বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তুলে এনে, সমাকালীন সাহিত্য জগতে প্রকাশ করলেন এক বিরল সাহিত্য প্রতিভাকে।

এমনই একজন মায়ের সাহচর্যে এবং গুণী পিতার স্নেহে 'ভালো-বাসা' বাড়িতে নবনীতা দেব সেন বড় হতে থাকেন। পড়াশুনা শুরু করেন উষালতিকা সেনস চিলড্রেনস কর্ণার নামের কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে। তার পর গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে পড়া শেষ করে লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পড়েন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজী সাহিত্যে বি.এ পাস করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ থেকে এম.এ (১৯৫৮) পাস করেন প্রথম বর্ষের ছাত্রী হিসেবে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। তারপর নবনীতা দেব সেন উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে যান। হার্ভার্ডে ডিস্টিংশন নিয়ে এম.এ পাস করেন ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। কেমব্রিজ, ইন্ডিয়ানা থেকে পি.এইচ.ডি করেন পাশ্চাত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাকে কী ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়ে। ১৯৬৪-৬৫ সালে বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টোরল গবেষণা করেন ;

যার বিষয় ছিল 'Technique of Oral Composition : A Structural Analysis of Valmiki'। ইংলন্ড এবং আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে গিয়ে এবং তারপর বৈবাহিক সূত্রেও যখন নবনীতা লন্ডনে ছিলেন তখন নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ আটলান্তিকের দুই তীরে আছড়ে পড়ছে। ১৯৫৩ সালে সিমন দ্য বোভোয়ার এর বিখ্যাত *The Second Sex*[৮] ইংরাজিতে অনুবাদ হওয়ার পর থেকে নারীবাদের যে দ্বিতীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাই ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে মহাদেশের সীমানা অতিক্রম করে। ১৯৬৩ সালে নারীবাদী তাত্ত্বিক ব্রেটি ফ্রাইডেন তাঁর গ্রন্থ *The Feminine Mystique*[৯] এ বলেন মূল ধারার সংস্কৃতি নারীকে কীভাবে উপস্থাপিত করে এবং নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা হল সামাজিক অপচয়। ১৯৭০ সালেই প্রকাশিত হয় নারীবাদী তত্ত্বের আকর গ্রন্থ কেট মিলেটের *Sexual Politics*। এই সব বইয়ের ভিত্তিতে স্কুল-কলেজ-শিক্ষাক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তাই বিদেশে থেকে এবং শিক্ষিত, সমাজসচেতন মানুষ হিসেবে নবনীতা সেই বিষয় নিয়ে সচেতন হবেন সেটাই স্বাভাবিক। আর নবনীতা যে এই বিষয় নিয়ে ওয়াকিবহাল তা বোঝা যায় ১৯৭৩ সালে নবনীতা দেব সেনের লেখা 'ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা' গল্পে। বিশেষ অতিথি হয়ে সেমিনারের নির্দিষ্ট দিনের আগেই নবনীতা যখন পৌঁছে যান গন্তব্যস্থলে এবং তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় বয়েজ হোস্টেলে, তখন বয়েজ হোষ্টেলের লোকজনের তাঁর সম্বন্ধে মনোভাব বোঝাতে গিয়ে নবনীতা বলেন— "...আমার তো সন্দেহ, আশ্রয়টা মিলেছিল "সহায়হীনা নারী" পর্যায়ের কার্যক্রমেই। নারীমুক্তি আন্দোলন তখনও এতটা চালু হয়নি, তাই। হলে কী হতো বলা যায় না।"[১০]

এভাবেই নবনীতা নিজের স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে জানিয়ে দেন সময় সম্বন্ধে নানান তথ্য। পরবর্তীকালে গবেষণা, অধ্যাপনা, সেমিনার বা বাংলা সাহিত্যের প্রতিনিধি

রূপে নবনীতা দেব সেন দেশ-বিদেশের নানা জায়গার গেছেন সেই সব জায়গার স্মৃতি থেকে লিখেছেন ভ্রমণ কাহিনি। যার সূত্রপাত হয় গোখেল স্কুলে পড়াকালীন, যখন সে তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথম ইউরোপ ভ্রমণে যান। ফিরে এসে নবনীতা লেখেন নিজের ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই লেখা সম্বন্ধে সেই সময়ে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা জানাতে গিয়ে বিখ্যাত নারীবাদী গবেষক, অধ্যাপক, এবং নবনীতার ছোটোবেলার বন্ধু যশোধরা বাগচী (১৯৩৭-২০১৫) বলেন-

> …When published here it was so good that I remember undiscerning readers commenting that it must have been written by her father (not even her mother!)[১১]

যশোধরা বাগচীর "(not even her mother!)" কথাটির দ্বারা সেই সময় এবং সমাজের একটি সত্য উঠে আসে, তা হল উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের ভ্রমণ কাহিনি লেখার একটা ক্ষীণ ধারা প্রচলিত থাকলেও শিক্ষিত সমাজ মেয়েদের লেখা ভ্রমণ কাহিনির সাহিত্যিক মূল্য সহজে মেনে নিতে অভ্যস্থ ছিল না তখনও। তাই নবনীতা দেব সেন তো নয়ই এমনকি রাধারাণী দেবী যিনি সেই সময়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক তাঁকেও এই কাহিনির লেখক ভাবতে পারছেন না তারা। হয়তো এই ঘটনাই নবনীতার মনে ছাপ ফেলেছিল। আর তাই পরবর্তী কালে সমাজের এই ধারণাকে দুর্মুষ করলেন কালজয়ী সব ভ্রমণ কাহিনি লিখে, যার সূত্রপাত 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে' (১৯৭৮) রচনার মাধ্যমে।

ভ্রমণ কথাটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় 'ভ্রম' আর 'রমন'। ভ্রমণে যওয়ার পথের নানা অভিজ্ঞতা, নানা ভ্রম নিয়ে লিখলেন ভ্রমণ কাহিনি মূলক ছোটগল্প—'ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা', 'হাওয়া-ই-হিন্দ', 'অপারেশন ম্যাটারহর্ণ' যাদের মধ্যে অন্যতম। একজন মেয়ে হয়ে

নিজের পরিচিত গন্ডি মুছে নবনীতা যখনই বেড়িয়ে পড়তে চেয়েছেন অজানার উদ্দেশ্যে ততবারই শুভাকাঙ্খী থেকে সদ্য চেনা মানুষও তাকে নিবৃত্ত করতে চেষ্ঠা করেছেন। কারণ সমাজ মেয়েদের জন্যে কিছু নির্দিষ্ট ভূমিকা আগে থেকে নির্ধারিত করে রেখেছে। যখনই তার ব্যতিক্রম হয়েছে তখনই তা সমাজের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ হয়নি। কিন্তু নবনীতা নিজের ছন্দে চলে এই মানুষগুলোকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন বারবার। 'অপারেশন ম্যাটারহর্ণ' গল্পে দেখি নবনীতা এবং তাঁর দক্ষিণী বন্ধু রেণুকা আল্পসের ম্যাটারহর্ণ শৃঙ্গে চড়বেন বলে বেড়িয়ে পড়েছেন কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই কিন্তু শুধু ইচ্ছের বলে তো আর এই অসাধ্য সাধন সম্ভব নয়; বলা বাহুল্য সফলও হননি তাঁরা। কিন্তু এমন কিছু কল্পনা করার জন্যেও প্রয়োজন সাহসিকতার যা নবনীতা এবং তাঁর বন্ধুর মধ্যে ছিল ভরপুর। এই গল্পটা পড়ে পাঠক জানতে পারেন নবনীতা দেব সেন এবং তাঁর বন্ধু রেণুকা উৎসাহের বশে অসাধ্য সাধনের অলীক কল্পনা করে অসফল হয়েছিলেন। কিন্তু নিজের এই অসফলতার কাহিনি দ্বিধাহীন ভাবে জানিয়ে তার সঙ্গে নবনীতা জুড়ে দেন আর এক মেয়ের সফলতার কাহিনি। সেই মেয়েটি হলেন জুনকো তাবেই (১৯৩৯-২০১৬) যে বিশ্বনারীবর্ষে মানে ১৯৭৫ সালে জয় করেছেন এভারেস্ট শিখর। এভাবেই নিজের গল্পে অন্য মেয়েদের সফল্যের কাহিনিও লিখে রাখেন নবনীতা দেব সেন। গল্প পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দ্বারাও সমৃদ্ধ হন।

নবনীতার নিজের বিফলতার কাহিনির মধ্যেও লুকিয়ে থাকে একটা আত্মবিশ্বাসী মন। যে সমাজে মেয়েদের জন্যে বাড়ির বাইরে থাকার সময় বেঁধে দেওয়া হয় সেই সমাজের একজন মেয়ে হয়ে নবনীতা দেব সেন বিপদের তোয়াক্কা না করে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন নিজ শর্তে। সমাজের নির্ধারিত লিঙ্গভূমিকাকে মেনে না নিয়ে নিজের শর্তে বাঁচতে শেখান। এমনই একটি ঘটনা নিয়ে লেখা 'মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর' গল্পটি। গল্পে রাত বারোটায় নবনীতা

মোপেড শেখার চেষ্টা করেন পাড়ার রাস্তায়। মেয়েরা গাড়ি চালাবে একথা তখনও ভাবা সহজ ছিল না সেই সময়ে নবনীতা দেব সেন নিজেই নিজের গাড়ি চালান। আবার মোপেড ও শিখতে যান। সফল হলেন বা না হলেন তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই নতুন কিছু শেখার ইচ্ছা, নতুনকে জানার আগ্রহ। তিনি পাঠককে শেখান সমাজের নির্ধারিত লিঙ্গভূমিকা অন্ধভাবে পালন না করে সেগুলোকে প্রশ্ন করতে। সেই অদৃশ্য গন্ডিকে ভাঙতে।

পুরুষদের পৌরুষ প্রমাণ করতে গিয়ে সমাজ নারীদের নির্মান করেন কোমল, দুর্বল, ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দ্বারা। তার ওপর যদি সেই নারী অসুস্থ হন তাহলে সমাজের কাছে তা হয়ে ওঠে খুবই চিন্তার বিষয়। 'অলৌকিক রত্নভস্ম' গল্পে দেখা যায় রুগ্ন নবনীতার প্রতি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নিজেদের মত করে করা দয়া-মায়া-চিন্তা-ভাবনা। আসলে একেতে মেয়ে জাতি মাত্রেই দুর্বল তার ওপর অসুস্থ। নবনীতা নিজেই বলেন নিজের অসুস্থতার কথা কিন্তু সেটা মাঝে মাঝে কারণ তাঁর অদম্য ইচ্ছেশক্তি দিয়ে তিনি তাদের সবাইকে ভুল প্রমাণ করে দেন যার ভাবেন মেয়েরা দুর্বল জীব। দুর্বলতাকে তিনি অস্বীকার করেন না তবে তাকে জয় করে দেখান।

সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক হওয়ার জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। নবনীতা দেব সেন দেখান শিক্ষাক্ষেত্রও আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি অংশ। তাই তাঁদের ধারণা ও বিশ্বাসও আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ দ্বারাই নির্ধারিত। সেই ধারণার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে নবনীতা বলেন –

> মেয়েরা যেহেতু নিজেরাই হালকা পলকা এবং তাদের খুব একটা তলিয়ে ভাবার মত ওজনই নেই সুতরাং তারা লিখবে পলকা বিষয়বস্তু নিয়ে গুরুগম্ভীর গদ্য

পদ্য, গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে হালকা ভালে কলম চালানোর কম্মোটি তাদের নয়।

গম্ভীর বিষয়ে হালকা সুরে কথা বলবার অধিকার শুধু মগজ প্রধান পুরুষের।[১২]

এইরকম সমাজের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও নবনীতা দেব সেন এগুলিকে মনে করেন কুসংস্কার। তাই একদিকে যেমন লেখেন নিজেকে নিয়ে মজার গল্প অন্যদিকে লেখেন তাত্ত্বিক প্রবন্ধ যেমন- 'ANGOISSE-উৎকণ্ঠা-ANGUISH', 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী: শশী ও রিউ'।[১৩] একদিকে যেমন লিখেন কবিতা অন্যদিকে সমালোচনা সাহিত্য। নবনীতা তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যচর্চা দ্বারা মেয়েদের লেখা নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রচলিত তথাকথিত ধারণাকেই মিথ্যা প্রমাণ করেন। আসলে মেয়েদের কলমে মেয়েদের কথা বলা কতটা প্রয়োজন তা নবনীতা খুব ভাল করে বোঝেন।

অর্থনীতিবিদ্ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে নবনীতা দেব সেনের বিবাহ হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর দুই মেয়ে পিকো এবং টুম্পা যাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের বড় হতে দেখা যায় নবনীতার নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিয়ে লেখা গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে। বিবাহ বিচ্ছেদের পর (১৯৭৬) দুই মেয়ে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন নবনীতা দেব সেন। তার সঙ্গে চলতে থাকে বাংলায় সাহিত্য চর্চা এবং ইংরাজিতে নানান গবেষণাধর্মী লেখালেখি। কিন্তু তবুও তাঁর কবি-সাহিত্যিক-অধ্যাপক এই সব পরিচয়ের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের স্ত্রী শুধু না 'প্রাক্তন স্ত্রী' এই পরিচয়টি। হয়তো 'সেন' পদবী ব্যবহার করার জন্যে কিছুটা বাকিটা হল মনুর অমোঘ বচনের জন্যে অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী একজন নারী যতই নিজের পরিচয় তৈরী করুন না কেন তাঁকে কোনো না কোনো পুরুষের অধীনেই ভাবা হয়। তাই অমর্ত্য সেন নোবেল পুরষ্কার পেলে (১৯৯৮) নবনীতা দেন সেনকে কতটা বিব্রত হতে হয় তার পরিচয়

পাওয়া যায় এই নিয়ে লেখা ‘জরা হাটকে জরা বঁচকে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্ গল্পে’। পাড়ার দোকানদার থেকে মেট্রোর সহযাত্রী সবার মুখে আর চোখে একি কথা- “ওই দ্যাখ ওই দ্যাখ নবনীতা দেন সেন! কে বুঝলি? বুঝলি না? ওই তো, অমর্ত্য সেনের ফার্স্ট ওয়াইফ।”[১৪]

আর এই সব অযাচিত, কিছুটা অপমানযোগ্য অবস্থা থেকেই ‘জরা হাটকে জরা বঁচকে’ চলতে থাকে নবনীতা দেব সেনের নিজের অর্জিত আত্মপরিচয়ে পরিচিত হওয়ার লড়াই। যা উত্তরাধিকার সূত্রে বা বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত নয়, একেবারেই স্বনির্মিত। এভাবেই নবনীতা নিজে এবং নিজের পাঠককে আত্মপরিচয় তৈরী করতে শেখান।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ সমাজের কেন্দ্রে, তারাই সমস্ত ক্ষমতার শীর্ষে। সমাজে এবং পরিবারেও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান এই পুরুষটিকেই ঘিরে পরিবারের আরো মানুষদের অবস্থান। আর এমত অবস্থার ব্যতিক্রম হলেই ভাবা হয় আদর্শ পরিবার থেকে বিচ্যুতি। নবনীতা দেব সেন আদর্শ পরিবারের এই ধারণাকেই প্রশ্ন করেন বারবার। গল্পে দেখা যায় তাঁর কাছে পরিবার মানে- “এক প্রবল প্রতাপান্বিত কিন্তু শয্যাশায়িত মা, তাঁর বিবাহবিচ্ছিন্না চাকুরে মেয়ে, আর দুটি ইস্কুল কলেজ পড়ুয়া নাতনি –তিন প্রজন্মের নারীর এক মাতৃতান্ত্রিক সংসার।”[১৫]

এছাড়াও আছে আদুরে পোষ্য, ঘরের কাজে সাহায্য করার কিছু মানুষ। নবনীতা নিজেকে নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে পরিবারের সকলের কথাই তুলে ধরেন। নবনীতা নিজে একজন একক মা বা single mother এবং তাঁর গল্পেও এই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে। ‘পরীক্ষা’ গল্পে দেখি নবনীতার মেয়ের পরীক্ষা আসলে নবনীতারই পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়, উত্তম পুরুষ কথনে বলা এই গল্পগুলো হল একক নারীর, একক মাতৃত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ। নিজের

জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলতে পারেন সংসার করার জন্যে সংসারের মাথা হিসেবে একজন পুরুষের দরকার হয় না। এক জন নারীকে সম্পূর্ণ করার জন্যে তাঁর শিক্ষা, তাঁর আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ঠ। তাঁর লেখা পড়ে মেয়েরা নিজেরা একাই সুখী হতে শেখে। তিনি মেয়েদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে শেখান। আনন্দে বাঁচতে আর হাসতে শেখান; এককথায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে শেখান। একক মায়েরা যে কতটা শক্তিশালী এবং পরিশ্রমী তা বোঝা যায় তাঁর গল্পগুলোতে। সংসারের নানা দিক তাঁরা সমান ভাবে সামলান দশ হাতে। নবনীতা নিজের জীবন দিয়ে দেখান-"পুরুষবিহীন একক নারীর ঘর সংসার মাত্রেই যে বিবর্ণ, মলিন, 'সুখহীন নিশিদিন' হয় না, উজ্জ্বল, মননশীল, ব্যস্ত, মায়াবী, হাসি ঝলমলেও হতে পারে...।"[১৬] তা কতটা সত্য। নবনীতা নিজের গল্প লিখতে গিয়ে সমাজের প্রচলিত ধারণাকে ধূলিসাৎ করে এভাবেই বহু একক মায়েদের সংগ্রামকে খুব সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেন।

নবনীতা দেব সেনের লেখার একটি বৈশিষ্ট্য হল আত্মসমালোচনা। তাঁর কলমে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বিচারিতা যেমন ফুটে ওঠে ঠিক সেভাবেই নিজের দোষ-গুণের কথা বলতে এবং সেইগুলো নিয়ে নিজে হাসতে এবং অন্যকে হাসাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিভিন্ন সময়ে তিনি শুনিয়েছেন বেড়াতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়ানো থেকে জরুরি কাগজ হারিয়ে ফেলা থেকে নিজের জীবনকে অকারণে জটিল করার বৈচিত্র্যময় কাহিনি। তিনি নিজের এই 'trouble maker' ইমেজ যেমন তুলে ধরেন ব্যঙ্গাত্মক আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে, তেমনি তাঁর সঙ্গে এও দেখান যে সব কিছুকে অতিক্রম করার ক্ষমতাও তাঁর আছে । আসলে আত্মসমালোচনা খুব সহজ কাজ নয়। এই কঠিন কাজটাই নবনীতা করেন দক্ষতার সঙ্গে । আর তাঁর আসামান্য কৌতুকবোধ এই ধরণের লেখায় অন্য মাত্রা যোগ করে দেয়।

নবনীতা দেব সেন প্রায় অর্ধশত বর্ষ ধরে লিখে চলেছেন। তাঁর মেধা, প্রতিভা, সাহিত্য কীর্তি ও সারস্বত সাধনা তাঁকে এনে দিয়েছে দেশ-বিদেশের নানা পুরস্কার এবং সম্মান। যেমন- মহাদেবী ভার্মা পুরস্কার (১৯৯২), শরৎ পুরস্কার বিহার (১৯৯৪), সাহিত্য অকাদেমি (১৯৯৯) , পদ্মশ্রী (২০০০), কমল কুমারী জাতীয় পুরস্কার (২০০৪), ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার, মিস্টিক কলিঙ্গ সাহিত্য পুরস্কার (২০১৭) ইত্যাদি। তবে নবনীতা দেব সেন শুধুই নিজে লিখেছেন তা নয় সাহিত্য সমাজে মেয়েদের লেখা যেন তাঁদের লিঙ্গ পরিচয় দিয়ে বিচার না হয়, রাজনীতির পঙ্কিলতা যেন মেয়েদের কলমকে কলুষিত না করতে পারে তার জন্যে মেয়েদের নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন 'সই'। এই নামের মধ্যে মিশে আছে তিনটি অর্থ – সখী, সহ্য করি আর স্বাক্ষর। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে আজ এই প্রতিষ্ঠান সাবালিকা। শুধু বাংলা নয় সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারীবাদী লেখক এবং কর্মী এই প্রতিষ্ঠানে মিলিত হন। এই অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র 'সই-সাবুদ' পত্রিকায় মেয়েদের নিজেরদের লেখা ছাপা হয়। এর থেকে বোঝা যায় নবনীতার যাপনের সঙ্গে বিশ্বাসে কোনো পার্থক্য নেই । পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি তাঁর দ্রোহ সাহিত্যের পাতায় শুধু থাকে না। তাঁর বিশ্বাসকে, তাঁর লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে নিজে যেমন নানা ভাবে পরিশ্রম করেন তেমনই নিজের লেখা এবং কাজের মধ্যে দিয়ে মেয়েদেরকে প্রেরণা দেন নিজেদের কথা বলার, নিজেরদের প্রতিভাবে বিকশিত করার।

উত্তর আধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিক হেলেন সিক্সু (১৯৩৭) তাঁর 'The Laugh of the Medusa' প্রবন্ধে মেয়েদের লেখা লিখির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেন-

> Write let no one hold you back, let nothing stop you: not man; not the imbecilic capitalist machinery… and not yourself. smug faced readers

managing editors, and big boses don't like the true text of women-female-sexed text. That kind scares them. [১৭]

নবনীতা দেব সেনের লেখাতেও দেখা যায় সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে লিখে যাওয়ার প্রবণতা। একজন কবি-সাহিত্যিক-অধ্যাপক হিসেবে যে সূক্ষ্মতায়, যে গভীরতায় এবং যে ব্যাপকতায় জীবন এবং জগত তাঁর লেখায় ধরা দেয় তা পড়ে মেয়েরা একাত্ম হয় নবনীতার যাপনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে। তিনি নিজেকে নিয়ে লিখলেও সেই লেখায় থাকে বৃহত্তর প্রেক্ষিত, জীবন নিয়ে অনেক গভীর উপলব্ধি এবং তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতার অংশ। তাই তাঁর লেখা আর শুধু Personal থাকে না।

নবনীতা দেব সেন নিজের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা, ছোটো ছোটো ঘটনার ছবি সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন উত্তম পুরুষ কথনে। তাঁর সব লেখা পড়ে তৈরী হয় সাহিত্যের নবনীতা দেন সেন। এই সূত্রেই আসে তাঁর লেখা লেখার বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান অভিযোগ; নৈর্ব্যক্তিকতার (objectivity) অভাব। যেহেতু নবনীতা দেব সেন নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিয়ে গল্প লেখেন তাই খুব বেশি ভাবে তাঁর নিজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় গল্পে। লেখকের সঙ্গে লেখার যে একটা দূরত্ব থেকে তা প্রায় নেই তাঁর লেখায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় চার খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর গল্পসমগ্রে মোট একশো সাতটি গল্পের মধ্যে নবনীতা দেন সেন নিজে প্রত্যক্ষে আছেন প্রায় ২২টি গল্পে তাই নবনীতা দেব সেন নিজেকে নিয়েই লিখছেন এই কথা বললে বোধ হয় ঠিক হয় না। প্রত্যেক লেখকই জীবনের কোনো না কোনো অভিজ্ঞতা থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গল্প লেখেন। কিন্তু নবনীতা নিজের অভিজ্ঞতার পুঁজিতে শুধু কাল্পনিক চরিত্র তৈরি করে তাদের যাপনের মাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতার কথা

জানান না তিনি নিজেই চরিত্র হয়ে উত্তম পুরুষ কথনে নিজের গল্প লেখেন। তার ফলে পাঠকের কাছে তা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় ।

নবনীতা দেব সেনের নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিয়ে লেখা গল্পে যেমন বুদ্ধিমতী, সদাহাস্য, কৌতুকময়ী ঈষৎ অবাধ্য এক মেয়েকে দেখা যায় তেমনই দেখা যায় এক সৎ, সাহসী, স্থিতধী, বিদূষী সংবেদনশীল নারীকে । যে প্রয়োজনে কলম কে হাতিয়ার বানাতে জানে আবার সেই কলমে লেখে ভালোবাসার গল্প। স্বেচ্ছাচারী, প্রগলভ, উচ্ছৃঙ্খল, বিদ্রোহিনী না হয়েও যে আত্মশক্তিতে বলীয়ান, আত্মনির্ভর, স্বয়ংসম্পূর্ণ একক পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায় তা শেখা যায় তাঁর গল্প থেকে। সমাজের নির্দিষ্ট ছকে নারীর পূর্বনির্ধারিত ভূমিকা পালন না করে নিজের শর্তেও যে বাঁচা যায় নবনীতা দেব সেনের লেখা তারই পরিচয়বাহী। নবনীতা দেব সেন নিজের জীবন নিয়ে লিখতে লিখতে নিজের জীবন দিয়েই পুনর্নির্মাণ করেন নারীত্বের সংজ্ঞা। যেখানে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে হয় না বরং সব কিছুকে নিয়েই তৈরি হয় নারীর আত্মপরিচয়। তিনি নিজে বাঁচেন এবং আরো মেয়েদের বাঁচতে শেখান নিজ শর্তে। এই আত্মশক্তি, অন্যদের অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাসই নবনীতা দেব সেনকে এক আসাধারণ নারীতে পরিণত করে।

তথ্যসূত্র :

১ অনিল আচার্য (সম্পাদক),*একান্তর*, ক্রোড়পত্র, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ১২ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, শারদীয় অক্টোবর ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬৫

২, নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ এপ্রিল ২০১৮ পৃষ্ঠা ৫০

৩ তদেব পৃষ্ঠা ৮৩

৪ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত), *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ,কলকাতা, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা ৪৪৭

৫ এই গল্প নবনীতা দেব সেন নিজে বলেন দে'জ পাবলিশিং আয়োজিত তাঁর একাশিতম জন্মদিবস পালন অনুষ্ঠানে।

৬ অভিজিৎ সেন (সম্পাদিত), *রাধারাণী দেবী রচনা সংকলন ১*, ভূমিকা, 'রাধারাণী দত্ত,রাধারাণী দেবী এবং আমরা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৫

৭ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ আগষ্ট ২০১৭,পৃষ্ঠা ২৬৩

৮ Simone De Beauvoir, and H. M. Parshley. *The Second Sex*. David Campbell, 1993. Print.p xi

৯ Betty Friedan,. *The Feminine Mystique*. Dell, 1972. Print.p 132-159

১০ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪২

১১ Chakraborty, Dilipkumar, et al. *Nabaneeta 79*. Karigor, 2017. Print, p 10

১২, নবনীতা দেব সেন, *শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর*, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৫,পৃষ্ঠা ৯৯

১৩ তদেব,পৃষ্ঠা ২৯২

১৪ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৩*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ১৭৯

১৫ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, আগষ্ট ২০১৭,পৃষ্ঠা ২০৯

১৬ তদেব

১৭, Hélène Cixous, Keith Cohen, and Paula Cohen. "The Laugh of the Medusa." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 1.4 (1976) Print. pp 877.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাকাব্যিক নারীচরিত্রদের পুনঃনির্মাণ

রামায়ণ এবং মহাভারত ভারতবাসীর জীবন এবং যাপনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের সংস্পর্শে লেখ্য এবং শ্রাব্য রীতির মিশ্রণে রামায়ণ ও মহাভারত হয়ে উঠেছে epic of growth। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আধিপত্যে এবং হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের বিশ্বাসে, পুজোয় এবং যুগব্যাপী মাহাত্ম্যকীর্তনে মহাকাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো ঈশ্বরত্ব লাভ করেছে। গোপবালক হয়ে উঠেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর বাল্মীকির 'নরচন্দ্রমা' হয়ে উঠেছেন মহাপুরুষ শ্রীরাম। সাহিত্যের মূল ধারায় তাদের ঐশ্বরিক কাহিনির পুনর্নির্মান যেমন হয়েছে, দেবতা রূপে তাঁদের পুজো যেমন প্রচলিত হয়েছে সেই ধারার সমান্তরালে মানুষ হিসেবে এই মহান চরিত্রগুলোর সমালোচনাও হয়েছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অনুবাদক ও সাহিত্যিক এই প্রথাবিরোধী ধারায় সাহিত্য রচনা করেছেন। স্থান-কাল-পাত্র–সমাজ-রাজনীতি এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেই সব লেখা সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সূত্রপাত হলে তার বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল মহাকাব্যর আক্ষরিক অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ। এই অনুবাদের ধারায় ব্যতিক্রম ছিলেন কবি চন্দ্রাবতী (ষোড়শ শতাব্দী)। যাঁর প্রতিভার স্পর্শে 'রামায়ণ' প্রথম বার হয়ে উঠেছিল সীতায়ন। রামের বীরত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে চন্দ্রাবতী রামকে বলেছিলেন রামের বুদ্ধিনাশ হয়েছে তাই সীতাকে সে ত্যাগ করেছে। উনিশ শতকে সেই ধারাই পুনরুজ্জীবিত হয় মাইকেল মধুসূধন দত্তের (১৮২৮-১৮৭৩) 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ (১৯৬১)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) 'কাব্যে উপেক্ষিতা' (১৯০০) নামের প্রবন্ধে রামায়ণে লক্ষ্মণ পত্নী ঊর্মিলার নৈঃশব্দ্য নিয়ে প্রথম মুখর হলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র'(১৮৬১) প্রবন্ধে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করলেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'মহাভারত কথা' (১৯৭১-৭২)-য় নায়ক করলেন যুধিষ্ঠিরকে। এছাড়াও লিখলেন 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটক 'পুরাণের নবজন্ম' গল্প। প্রতিভা বসু লিখলেন

'মহাভারতের মহারণ্যে'। আর কৌতুকের দ্বারা রামায়ণের কাহিনি নিয়ে গল্প লিখলেন সুকুমার রায় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', লীলা মজুমদার 'লঙ্কা-দহন পালা', রাজশেখর বসু রামায়ণের অনুবাদের পাশাপাশি রামায়ণ নিয়ে 'রামরাজ্য' (১৯৫০), 'হনুমানের স্বপ্ন'-র (১৯৩০) মতো মজার গল্প লিখলেন পরশুরাম ছদ্মনামে। মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখলেন *সীতায়ন* (১৯৯৬)। আর এই ধারার অন্যতম শক্তিশালী লেখক হলেন নবনীতা দেব সেন। মহাকাব্য পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল-"এই বীর্যবাহুবলসর্বস্ব পুরুষমানুষের যুদ্ধকাব্যের জগতে নারীর ঠাঁই বড় করুণ।"[১] আর সেই কারুণ্যের স্বরূপ বাকি জীবন ধরে নবনীতা দেব সেন খুঁজেছেন প্রধানত দু'ভাবে বিদ্যায়তনিক পরিসরে এবং বিদ্যায়তনিক পরিসরকে ছুঁয়ে এবং অতিক্রম করে সৃজনশীল সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। তাই মহাকাব্যের নারীদের পুনর্নির্মাণ বুঝতে গেলে দুটি দিক সমান ভাবে আলোচনা জানতে হবে।

নবনীতা দেব সেন ১৯৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টোরাল করেন। গবেষণার বিষয় শিরোনাম ছিল 'Technique of composition : A Structural Analysis of Valmiki Ramayana'। মিলম্যান প্যারি ও অ্যালবার্ট বি লর্ডের হোমারের মহাকাব্য এবং যুগশ্লাভিয়ার মৌখিক গানের গঠনশৈলী বিষয়ে গবেষণালব্ধ তত্ত্বকে প্রয়োগ করে নবনীতা দেব সেন বাল্মীকি রামায়ণের বিশ্লেষণ করেন। যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁকে একজন রামায়ণ বিশারদ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এরপর নবনীতা দেব সেন ১৯৮৯ খ্রিঃ চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে 'রামায়ণের একটি মেয়েলি পাঠ'[২] হিসেবে পুনরাবিষ্কার করেন এবং চন্দ্রাবতীর লেখা রামায়ণকে নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৯১) বক্তৃতা দেন। এই সূত্রেই নবনীতা দেব সেন জানতে পারেন অধ্যাপক নারায়ণ রাও অন্ধ্রপ্রদেশের নিরক্ষর মেয়েদের রামায়ণ গান নিয়ে

গবেষণা করছেন। চন্দ্রাবতীর পালা শোনার সূত্রেই বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় মেয়েদের রামারণ গান শুনে যখন অন্ধ্রপ্রদেশে গিয়ে সেখানকার নিরক্ষর মেয়েদের রামায়ণ গান শুনলেন তখন নবনীতা দেব সেন আশ্চর্য হলেন রামায়ণ গান গুলোর ভাবগত এবং প্রকৃতিগত মিল দেখে। তারপর দক্ষিণে তেলেগু এবং পশ্চিমে মারাঠি মেয়েদের রামায়ণ গান সংগ্রহ করে এবং সুহৃদদের সহায়তার মানে বুঝে সেই গানগুলোর ইংরাজি অনুবাদ করার পর নবনীতা লক্ষ্য করলেন ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ব্যবধান সত্ত্বেও সীতার জীবনের এবং যাপনের নানা অনুষঙ্গ নিয়েই এই গান গুলো গাওয়া হচ্ছে। আবিষ্কার করেন ভারতবর্ষের মেয়েরা যখন রামায়ণ গায় তখন প্রধান হয়ে ওঠে সীতার দুঃখ। এছাড়াও চন্দ্রাবতী-রামায়ণ (ষোড়শ শতক), তেলেগু ভাষার প্রথম নারী কবি মোল্লার (ষোড়শ শতক) রামায়ণ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন ‘চন্দ্র-মল্লিকা’ নামক প্রবন্ধে, অন্ধ্রপ্রদেশের কবি রঙ্গনায়কাম্মার রামায়ণ নিয়ে আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন ‘রামায়ণবিষবৃক্ষম’। এভাবেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মেয়েদের লেখা রামায়ণ, গাওয়া রামায়ণ গান এবং রামায়ণ নিয়ে লেখা উপন্যাস, লোকগানের তুলনামূলক আলোচনা করে লেখেন ছয়টি প্রবন্ধ যা *চন্দ্র-মল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ* নামের প্রবন্ধের বইতে সংকলিত হয়।

নবনীতা দেব সেন তাঁর প্রবন্ধ ‘When Women Retell the Ramayana’[৩]-তে জানান মেয়েরা মূলত চার রকম ভাবে রামায়ণ পড়েন। প্রথমত, ধ্রুপদী কাহিনিকে বদল না করে প্রাথাগত দৃষ্টি দিয়ে রামায়ণ পাঠ। যেমন ভাবে পড়েছিলেন কবি মোল্লা। দ্বিতীয়ত, ধ্রুপদী কাহিনির পরিবর্তন না করেও নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রামায়ণের পুনর্নির্মাণ যেমন ভাবে রামায়ণ লিখেছিলেন চন্দ্রাবতী। তৃতীয়ত, কোনো আদর্শ বা তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই আদর্শের বা তত্ত্বের আলোকে রামায়ণকে দেখা যেমন রঙ্গনায়কাম্মা লিখছেন মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। চতুর্থত, সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রচলিত সীতার জীবন কাহিনি এবং গানের আড়ালে নিজের

দুঃখকে তুলে ধরে রামায়ণ গাওয়া। গ্রাম বাংলার অশিক্ষিত মেয়েরা যেভাবে রামায়ণ গান গেয়ে নিজেদের জীবনের কথা বলে আসছেন বহু যুগ ধরে। তবে নবনীতা দেব সেন রামায়ণের প্রসঙ্গ ধরে উদাহরণ দিলেও রামায়ণ নিয়েই শুধু বলেননি। সাধারণ ভাবে এপিক বা মহাকাব্য নিয়েই বলেছেন। তাই মহাকাব্য পাঠের এই চারটি সম্ভবনা যে কোনো মহাকাব্য পাঠের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

নবনীতা মহাকাব্য নিয়ে নানা স্তরে গবেষণার পাশাপাশি এই বিষয়ে সৃজনশীল সাহিত্যও রচনা করেছেন। বলা বাহুল্য তাঁর গবেষণা এবং সাহিত্য রচনা একে অন্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মহাকাব্য বিষয়ে, বিশেষত রামায়ণ নিয়ে তাঁর গভীর, সূক্ষ্ম, বৈচিত্র্যপূর্ণ, মনোগ্রাহী গবেষণা কৌতুকপ্রিয় স্বভাবের প্রণোদনায় মহাকাব্যের পুনঃকথন, বাংলা সাহিত্যে এই বিষয় নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের লেখা থেকে তাঁর লেখাকে আলাদা করেছে। নবনীতা দেন সেন রামায়ণের উদাহরণ দিয়ে মহাকাব্যের পুনর্নির্মাণের যে চারটি সূত্র দিয়েছেন তাঁর অনেক আগে থেকেই এমন কি চন্দ্রাবতী রামায়ণের পুনরাবিষ্কারের মানে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের আগে থেকেই মহাকাব্যের নারীচরিত্রদের নিয়ে তিনি গল্প লিখছেন। মহাকাব্যের পুনঃকথন করে নবনীতা দেব সেনের লেখা প্রথম গল্পগ্রন্থ হল *সীতা থেকে শুরু* (১৯৯৬) এই গ্রন্থ তিনটি ভাগে বিভক্ত- "পৌরাণিকী", "মাতৃয়ার্কি" আর "আধুনিকী"। প্রথম ভাগ পৌরাণিকীতে গল্পের সংখ্যা মোট ছয়টি। রামায়ণ নিয়ে চারটি আর মহাভারত নিয়ে দুটি। এই গল্পগ্রন্থের ভূমিকাতে নবনীতা দেব সেন বলছেন এই গল্পগুলোতে "ধ্রুপদী কাহিনির কোনো রদবদল হয়নি কেবল কিছু কল্পিত ঘটনা যুক্ত হয়েছে।"[৪] ধ্রুপদী কাহিনির সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ যে বিকল্প কাহিনির আভাস আমাদের দিয়েছেন তা নবনীতা দেব সেন প্রদত্ত পূর্বে বলা সূত্র অনুযায়ী এক নং দুই নং

সূত্রের মিশ্রণ। ধ্রুপদী কাহিনির কিছু বদল ঘটেনি আবার তার সঙ্গে মিশেছে নবনীতা দেব সেনের নিজের সংবেদনশীল মনন।

এই গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'মূল-রামায়ণ' লেখা হয়েছিল ১৮৮৬ সালে আর শেষ গল্প লেখা হয় ১৯৯৫ তে। তাহলে ভাবা যেতে পারে মধ্যবর্তী কোনো সময়েই গল্পগুলো লেখা। বইয়ের প্রকাশের সময়কালটা ভারতবর্ষের ইতিহাসেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ১৯৯২ এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভিন্ন মাত্রা ধারণ করছিল বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করে। সারা দেশ জুড়ে ধর্ম আর রাজনীতি মিলে মিশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে দেশীয় বৃহত্তর জনতার আবেগের শীর্ষে যখন ছিল রামভক্তি তখন নবনীতা দেব সেন রামায়ণকে নিয়ে লিখছেন কৌতুক কাহিনি। শুধু ছোটগল্প নয় এই অগ্নিগর্ভ রক্তাক্ত সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁর আর একটি উপন্যাস "বামা-বোধিনী" (১৯৯৭)। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অংশুমালাও গবেষণা করছে রামায়ণ নিয়ে এবং রামায়ণ কেন্দ্রিক সেই গবেষণাধর্মী লেখা ছাপাতে দিলে তার সুহৃদরা তাকে সেই লেখা ছাপাতে বারণ করছে কারণ সেই লেখায় আছে ধর্মীয় অনুষঙ্গ। তাই সবাইকে উপেক্ষা করে অংশুমালা লেখা পাঠালেও তা ফিরে আসে। আর উপন্যাসের এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যখন মহাকাব্য নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখার জায়গা প্রায় ছিল না নবনীতা দেব সেন তখন মহাকাব্য নিয়ে লিখছেন কৌতুক কাহিনি এবং উপন্যাস। বলা বাহুল্য, নবনীতা দেব সেনের সঙ্গে উপন্যাসের অংশুমালা চরিত্রের বেশ কিছু সূক্ষ্ম মিল পাওয়া যায়। এই সহসী পদক্ষেপ অংশুমালা শিখেছেন যেন নবনীতার কাছ থেকেই। শুধু বিষয়গত দিক থেকে নয় আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এই উপন্যাসে মিলে যাচ্ছে তেলেগু ও মারাঠি ভাষায় লেখা রামায়ণ গানের অংশ, ময়মনসিংহের লোকনসংগীত, মঙ্গলকাব্যের ফুল্লরা বা খুলনার বারোমাস্যার ধাঁচা, তাঁর নিজের লেখা কবিতা এবং গবেষণার নোট। এই সব কিছুকে অদৃশ্য বন্ধনে বেঁধেছেন নবনীতা

নিজে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে। সীতার মিথ, ষোড়শ শতকের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর জীবনের গল্প এবং একুশ শতকের আধুনিক মেয়ে অংশুমালা নিজে, মারাঠি বান্ধবি মালিনী, আশ্রিতা কমলাম্মার গল্পে মিলে মিশে একাকার হয়েছে নবনীতার নিজের জীবন। এই উপন্যাস মহাকাব্য পুনঃকথনের প্রদত্ত চারটি সূত্রের মধ্যে চতুর্থ সূত্র মেনে লেখা।

নবনীতা দেব সেন *সীতা থেকে শুরু* গল্পগ্রন্থের ভূমিকাতেই বলেছিলেন মহাকাব্যের মেয়েদের নিয়ে আরো হয়তো গল্প লিখবেন। আর ২০০১ সালেই তিনি এই ভাবেই মহাকাব্যের নারী চরিত্রদের পুনর্নির্মাণ করে লিখে ফেললেন *সপ্তকান্ড*। যেখানে রামায়ন এবং মহাভারত মিলিয়ে মোট গল্প আছে সাতটি ; রামায়ণ নিয়ে ছয়টি এবং মহাভারত নিয়ে একটি । কিন্তু এই গল্পগুলোর সঙ্গে *সীতা থেকে শুরু* গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাচ্ছে কারণ আগের গল্পগুলোতে রামের ও রামায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা থাকলেও তা ধ্রুপদী কাহিনিকে অবিকৃত রেখে আর কিছুটা কল্পনাকে আশ্রয় করে লেখা ছিল। কিন্তু এই গল্পগ্রন্থের সব কাহিনিই হয় কল্পিত না হয় নানা রাজ্যের প্রচলিত লোককথা থেকে সংগৃহীত। তাই মহাকাব্য পাঠের সূত্র অনুযায়ী এখানে অনুসৃত হয় দুই এবং চার নং সূত্র। সুতরাং দেখা গেল নিজের দেওয়া সূত্র অনুযায়ী নবনীতার লেখাকেও সূত্রায়িত করা যায়। তবে তাঁর লেখায় সেই সূত্রগুলো একে অন্যের সঙ্গে মিশে তৈরী হয়ে যায় মহাকাব্য পাঠের বিকল্প নানা সম্ভবনা।

নবনীতা বলছেন- "সে লক্ষ্মীই হোক আর অলক্ষ্মী। সীতাই হোক বা দ্রৌপদীই, তাড়কাই হোক বা শূর্পনখা, যেন দুঃখ পেতেই তাদের জন্ম...এভাবেই কয়েকটা গল্প লেখা হয়ে গেছিল মহাকাব্যের মেয়েদের ঘিরে।"[৫] অর্থাৎ মহাকাব্যের নারীরাই যে হবেন তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্র তা আগে থেকেই বলে দেন নবনীতা দেব সেন। প্রসঙ্গক্রমে আসে রাম, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, দুষ্মন্ত আরো অনেক পুরুষ চরিত্ররা। নবনীতা দেব সেন তাঁর *সীতা থেকে শুরু* গল্পের ভূমিকাতেই

আরো বলেন মেয়েদের “দুঃখের মূল্যেই মহাকাব্যের নায়কদের বীরোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয়”[৬] যা আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই আর একটা নিয়ম তাই তাঁর লেখা গল্পে তিনি এই প্রথার উলটপুরাণ মানে পুরুষচরিত্রদের কাপুরষতার মূল্যে নারী চরিত্র গুলোকে নির্মাণ করেন না। ধ্রুপদী কাহিনি অনুযায়ী বা প্রথাগত ভঙ্গিতে পুরুষ চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের কৃতকার্যের যথার্থ, সূক্ষ্ম এবং যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা দিয়ে চরিত্র গুলোর হীনতা কাপুরষতা, দ্বিচারিতা কিছুটা হাস্য-কৌতুক এর আবরণে তুলে ধরেন। এই ভাবেই নবনীতা দেব সেন পুরুষতন্ত্রের দেখানো পথে না হেঁটে বরং আরো যুক্তিপূর্ণ পথে তাঁদের সমালোচনা করেন।

যে নারী চরিত্রগুলো নিয়ে নবনীতা দেব সেন গল্প লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি নারী চরিত্র নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হল-

সীতা

সীতা নামটি শুনলেই আমাদের মনে পড়ে একজন আদর্শ বধূ, সর্বংসহা নারীর চিত্র। যুগ যুগ ধরে শ্রেষ্ঠ নারীর সম্মান তিনি পেয়ে এসেছেন। ‘মূল রামায়ণ’, ‘অমরত্বের ফাঁদে’, ‘সীতার পাতাল প্রবেশ’, ‘বসুমতীর কেরামতি’ এবং ‘মৎস্যমুখী’ প্রধানত এই পাঁচটি গল্প নবনীতা দেব সেন লিখছেন সীতাকে নিয়ে, সীতার চরিত্রের নতুন নতুন দিক তুলে ধরছেন এই গল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে। তাই এই সবকটা গল্প মিলিয়েই নবনীতা দেব সেনের সীতার নির্মাণ বুঝতে হবে। যেহেতু নবনীতা এই চরিত্রগুলোর পুনর্নির্মাণে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন তাই সব কটি চরিত্র নির্মাণে কল্পনা থাককেও তা একেবারে যুক্তিবর্জিত নয় মানে কল্পনার মধ্যেও

একটা যুক্তিক্রম আছে। প্রায় সব রামায়ণে সীতার সঙ্গে দেখা করার জন্যে হনুমান লঙ্কায় যান এবং সীতার খবর নিয়ে ফিরে আসেন রামের শিবিরে। 'মূল-রামায়ণ' গল্পে দেখি সীতার সঙ্গে দেখা করতে হনুমান লঙ্কায় গেলে সাহসী রাজকুমারী সীতা হনুমানের কাঁধে চেপে রামের কাছে চলে, আসেন যুদ্ধ হওয়ার অনেক আগেই। ভেবে দেখলে এই ভাবে যদি সীতা চলে আসতেন তাহলে যুদ্ধা এড়ানো সম্ভব হত তেমনই বহু মানুষের প্রাণ বাঁচতো। আর সীতারও রামের কাছে ফেরা সম্ভব হত। কিন্তু এমন হলে রাম-রাবণের যুদ্ধ হত না। এবং রামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হত না। সেই ভয় থেকে কিছুটা এবং স্ত্রীসুলভ আচরণ না করার তাই গল্পে বাল্মীকি সীতাকে অপমান করেন। কিন্তু নবনীতার সীতা সেই অপমান সহ্য করার পাত্রী নন তাই সীতাও বাল্মীকিকে বলে দেন-

> মুখ সামলে কথা বলুন ঋষিমশাই! জানোয়ার আবার পরপুরুষ কী? বাঁদর কী মানুষ? পিতৃগৃহে কত অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছি কেবলমাত্র ব্যায়েমের উদ্দেশ্যে...আজ উঁইপোকার কল্যাণে আপনি ঋষিমুনি বনে গেলে কী হবে; ছিলেন তো সেই চোর ডাকাতই-মনের মালিন্য আপনার কাটেনি মুনিবর।[৭]

সীতার কাছে ধমক খেয়ে বাল্মীকির পৌরুষে আঘাত লাগে তাই বাল্মীকিও মনে মনে ভাবেন "বড্ডো তেজী মেয়েমানুষ, না? আচ্ছাঃ, আমিও মহাকবি বাল্মীকি। দেখে নেবো ! তোমার কি হাল করি তুমি দেখো"।[৮] বলা নিষ্প্রয়োজন এখানে সীতা মহাকাব্যের প্রধান নারী চরিত্র এবং বাল্মীকি শুধু মহাকাব্যের রচয়িতা থাকেন না এখানে আসে ক্ষমতার খেলা। নবনীতার দৃষ্টিতে একজন ক্ষমতাবান পুরুষের কাছে তেজী মেয়ে মানুষের শায়েস্তার কাহিনি হয়ে ওঠে রামায়ণ।

'মৎস্যমুখী' (১৯৯৭) গল্পটি সীতাকে নিয়ে একটি কল্পিত ঘটনা। এই গল্পে একজন বাঙালি মেয়ে হিসেবে সীতার পরিচয় পাওয়া যায়, যে মাছ খেতে ভালোবাসে। সম্ভবত নবনীতা দেব সেন এই গল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সীতাকে নিয়ে গাওয়া লোক গান গুলো থেকে। কারণ এই গানগুলোতে সীতার গর্ভধারণ সময়ে কী কী খেতে ইচ্ছে করত প্রায় সব কিছুর কাল্পনিক বর্ণনা আছে। কিন্তু গল্পে দেখা যায় সীতা মাছ খেতে চাইলে তাঁর ইচ্ছার মর্যাদা রাখছেন লক্ষ্মণ এবং রাবণ। কিন্তু রাম তাঁকে বলছেন "এ কী ! মেয়েমানুষের এত নোলা!"[৯]। বাংলা প্রাবদে সুযোগ্য পাত্রীর সংজ্ঞা নির্মাণ করতে গিয়ে বলা হয় 'পা বড় ও জিভ বড়' মেয়েমানুষ ভালো নয়। বোঝাই যাচ্ছে জিভ বড় মানে বোঝানো হচ্ছে খেতে ভালোবাসে এমন মেয়েদের কথা। রামচন্দ্রের মতে মাছ খাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সেই কথা বলা আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য না বরং সেই ইচ্ছের অবদমনই আদর্শ নারীর প্রকৃত পরিচয়। বাংলা সাহিত্যেও খেতে ভালোবাসে এমন মেয়েদের পরিচয় পওয়া যায়। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) উপন্যাসেও দেখা যায় দুর্গা খেতে ভালোবাসে বলে তাকে বিভিন্ন মানুষের কাছে গঞ্জনা শুনতে হয়। 'পুঁইমাচা' গল্পেও এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। নবনীতা দেব সেন দেখালেন মেয়েদের ইচ্ছে বা সাধ থাকাও স্বাভাবিক আর নবনীতার সীতা সেই ইচ্ছের কথা জানাতেও পিছপা হন না।

'অমরত্বরে ফাঁদে' গল্পে নবনীতা দেখান লঙ্কায় সীতা ভালোই ছিলেন তাঁর মনে আশাও ছিল যে রাম এসে তাঁকে উদ্ধার করবে। কিন্তু তাঁর মোহভঙ্গ হয় যখন সীতা নিজের কানে শোনেন-

> সীতা গেছে যাক গে, অমন কত সীতাই আমার হবে , যদি কপালে বউ থাকে ;
>
> কিন্তু লক্ষ্মণ ভাই তো আর হবে না?...তুমি বাইরের মেয়ে, পর। তোমাকে বাঁচাতে

গিয়ে আজ আমি ঘরের ছেলেকে হারালাম। বউ গেলে নতুন বউ হয়, এটা কোনো ব্যাপারই না। কিন্তু পিতার স্বর্গ লাভের পর ভ্রাতা গেলে নতুন ভ্রাতা তো আর পাওয়া যায় না[১০]

লক্ষ্মণ মূর্ছা গেলে রামের এই আর্তনাদ শুনে আসলে সীতা শুধু নয় ত্রিজটার মত চেড়িরাও বুঝে যায় সীতার প্রতি রামের ভালোবাসার স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পেও দেখা যায় পুরুষদের একই মানসিকতার প্রতিফলন। এভাবেই ভালো মানুষের মুখোশ খুলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থপরতার স্বরূপ তুলে ধরেন নবনীতা দেব সেন।

ধ্রুপদী রামায়ণে রাম সীতাকে রাজসভায় ডেকে দ্বিতীর বার অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেন। এবং এই অপমান সহ্য না করে সীতা পাতাল প্রবেশ করেন। কেউ কেউ আবার সীতার পাতাল প্রবেশের ঘটনাকে তাঁর প্রতি হওয়া অবিচারের প্রতিবাদ হিসেবে ভাবতে চেয়েছেন। 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পে নবনীতা দেব সেন কল্পনা করেছেন-"রামচন্দ্রের বাঁ দিকে একটা বোতাম ছিল। বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি বোতামটি টিপে দিলেন স্বর্ণ সিংহাসন সমেত সীতা রসাতলে নেমে গেলন।"[১১] নবনীতা সীতার পাতাল প্রবেশকে গৌরাবান্বিত করার বদলে পাতাল প্রবেশের পুরো ঘটনাটিকেই তীব্র সমালোচনা করে বলেন সীতার পাতাল প্রবেশ সীতার সিদ্ধান্ত মনে হলেও নবনীতা দেখান তা আসলে সীতার নেওয়া নয়। রামচন্দ্র তাকে বাধ্য করেছিল এই কাজের জন্যে। আর এই ভাবনাকে তুলে ধরার জন্যেই বোতাম টেপার কাল্পনিক অনুষঙ্গ আনেন নবনীতা। আর এই গল্পের মাধ্যমে আর এক বার প্রমাণিত হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যন্ত্র সভ্যতার সুফলকে কীভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করছে বা যন্ত্র সভ্যতা পুরুষতন্ত্রের হাতে কীভাবে নারীর অপর ক্ষমতা বা আধিপত্য বিস্তারের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এই গল্প তারই প্রমাণ।

‘বসুমতীর কেরামতি’ গল্পে নবনীতা দেখান মা হিসেবে মেয়ের উপর হওয়া অবিচারের যোগ্য জবাব দিচ্ছেন বসুমতী। এক জন নারী হয়ে আর এক জন নারীর দুঃখকে বুঝতে পারলে তাঁর সহায়তা করতে পারলে পুরুষতন্ত্রের মোকাবিলা করা অনেকটাই সহজ হয়। বসুমতী কিন্তু সীতাকে রামের কাছে ফিরে যেতে বলছেন না, এমনকি লক্ষ্মণ বা অন্য কেউ দেখা করতে গেলে সীতার অনুমতি নিচ্ছেন। সীতা এখানে রামকে প্রত্যাখ্যান করে ব্রতেশ্বরী রূপে পূজিত হয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন। মা বসুমতীর সঙ্গে মিলে সীতা এখন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ তৈরি করেছেন।

সব মিলিয়ে নবনীতা দেব সেনের সীতা আত্মশক্তিতে বলীয়ান, নিজের উপর হওয়া অবিচার সম্বন্ধে সচেতন এবং রামচন্দ্রের মত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মুখপাত্রদের প্রকৃত পরিচয় অনুধাবন করার পর তাদের সংসর্গ বর্জিত স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী করতে আগ্রহী। নবনীতা দেব সেনের পাশাপাশি রামায়ণ এর সীতা চরিত্রটির ও আধুনিক নির্মাণ করেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত ‘সীতায়ন’ উপন্যাসে(১৯৯৬)।

ঊর্মিলা

বাল্মীকির *রামায়ন,* কম্বনের *রামায়ণ* (দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক), তুলসীদাসের *রামচরিতমানস* (ষোড়শ শতক), বাংলায় কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*, ইংরাজীতে লেখা আর.কে.নারায়ণের রামায়ন সব ক্ষেত্রেই দেখা যাই ঊর্মিলা চরিত্রটির নৈঃশব্দ্য। মহাকাব্যে প্রধানত তাঁর দুটি পরিচয় এক, রাজা জনকের কন্যা, দুই, লক্ষ্মণের স্ত্রী। এবং এই দুই পরিচয় মিলে মহাকাব্যে তাঁর ভূমিকা হল সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা এবং পুত্রবধূ হয়ে তাঁর স্বামী এবং

পরিবারের তাঁর জন্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া। রামের সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত লক্ষ্মণ যেমন ঊর্মিলাকে জানিয়েছিলেন। তাঁর মত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি তাঁর কারণ মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কোনো স্ত্রীলোকের পরামর্শ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ ভাবনার এত গভীরতা একজন নারীর কাছে আশা করে না পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে না দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় নারীদের ওপর।

মহাকাব্যে ঊর্মিলার নৈঃশব্দ্য নিয়ে প্রথম মুখর হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন-

> উর্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহ সভায়। তার পরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবিপুল অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহসভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। উর্মিলা চিরবধূ-নির্বাক্ কুণ্ঠিতা, নিঃশব্দচারিণী।[১২]

রামায়ণ-এ উপেক্ষিতা ঊর্মিলাকে নবনীতা দেব সেনও পুনর্নির্মাণ করলেন তাঁর ছোটোগল্পে। ঊর্মিলাকে নিয়ে তাঁর ছোটোগল্প প্রধানত দু'টি; 'লক্ষ্মণের হাসি' এবং 'ঊর্মিলা-নিদ্রা'। দুটি গল্পই প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে 'লক্ষ্মণের হাসি' গল্পটি যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই শুরু হয় 'ঊর্মিলা নিদ্রা' গল্পটি। তাই প্রথম গল্পটির পটভূমিতে দ্বিতীরটিকে পড়লে দেখা ঊর্মিলা বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি হয়। কৃত্তিবাসী *রামায়ণ*-এ লক্ষ্মণ রাম এবং সীতার সেবা করার জন্যে সারা দিন রাত জাগ্রত এবং সচেতন থাকতেন। এমনকি নিদ্রা দেবীকেও সে পরাজিত করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে লক্ষ্মণ বলেন-

> আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়ানে।

ক্রোধ করি নিদ্রারে বিন্ধিনু এক বাণে।।

কহি শুন নিদ্রাদেবি আমার উত্তর।

এসোনা মোর কাছে এ চৌদ্দ বৎসর।।

রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যা পুরেতে।

বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে।।

ছত্রদন্ড ধরে আমি দাঁড়াব দক্ষিণে।

সেইকালে এস নিদ্রা আমার নয়ানে।।[১৩]

কৃত্তিবাসী রামায়ন-এর সঙ্গে নবনীতা দেব সেনের 'লক্ষ্মণের হাসি' গল্পে এই পর্যন্ত মিল পাওয়া গেলেও নবনীতা তাঁর গল্পে বলেন লক্ষ্মণের সঙ্গে নিদ্রাদেবী রোজ যুদ্ধ করে হেরে গিয়ে যখন যোগ্য হিসেব রক্ষকের মত ঘুমের হিসেব মেলাতে পারলেন না বলে কান্না কাটি করেন, তখন লক্ষ্মণ নিজেই নিদ্রাদেবীর এবং ঊর্মিলার মত দুই কোমল, অসহায় নারীর ব্যবস্থা করে দেন একটি উপায়ে-

> ...আমার চোদ্দ বছরের ঘুমের চেষ্টা তুমি ঊর্মিলার চোখে চাপিয়ে দাও।...এমন আছাড়ি পাছাড়ি হয়ে বিরহদশায় জর্জরিত হলে, ওর স্বাস্থ্যও যে ভেঙে যাবে। এখনও তার সন্তানধারণ করা বাকি।" লক্ষ্মণের গলায় এবার সত্যি সত্যি একটু দুর্ভাবনা ফুটলো।[১৪]

লক্ষ্মণ ঊর্মিলাকে একজন স্ত্রীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। তাঁর মতামত নেওয়ার প্রয়োজন না মনে করেই চলে যান রাম এবং সীতার সঙ্গে। তারপর তাঁর 'লক্ষ্মণহীন' জীবনের নকশাও নিজে এঁকে দিলেন নিদ্রাদেবীর সাহায্যে। ঊর্মিলার জন্যে লক্ষ্মণের গলায় "সত্যি সত্যি" দুর্ভাবনা ফুটে উঠল তখনই যখন লক্ষ্মণের মনে পড়ে গেল তাঁর সন্তান ধারণ বাকি। এই

ভাবনার দ্বারা আর এক বার প্রমাণিত হয় নারী শরীরকে প্রধানত ভাবা হয় সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রভূমি রূপে। নবনীতা তাঁর গল্পে ঊর্মিলার এতদিনের রাগ অভিমান, দুঃখ, অসহায়তা, একাকীত্বর সঙ্গে প্রতিমূহূর্তে লড়াইকে প্রাধান্য দিলেন। চোদ্দ বছরের চাপা অভিমান নিয়ে যে মহাকাব্য নীরব তাকে মূর্ত করার জন্যে এমন একটা কাল্পনিক ঘটনার অবতারণা করলেন যার ফলে ঊর্মিলার নিজের অভিমান বোঝানো সহজ হয়ে গেল। নবনীতা দেব সেনের ঊর্মিলা কিন্তু তাঁর ওপর হওয়া অবিচারের কথা ভুলে নিজের বাধ্য, অনুগত নারীর ভূমিকা পালন করলেন না। তাই চোদ্দ বছর পর লক্ষ্মণ যখন সঙ্গসুখ আশায় মরিয়া হয়ে ঊর্মিলার কাছে এলেন। তখন ঊর্মিলা বললেন-““কে? কে? এই স্পর্ধিত রাজপুরুষ? কী করে প্রবেশ করলেন ইনি অন্দরমহলে?” তারপরেই চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন, “প্রহরী। প্রহরী।””[১৫] লক্ষ্মণ ঘুমের দ্বারা ঊর্মিলাকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন আর সেই অস্ত্রই ব্যবহার করলেন ঊর্মিলা লক্ষ্মণকে ভুলে থাকার জন্যে। আসলে এটি ছিল ঊর্মিলার স্বামীকে তিনি চিনতে না পারার ভান। এই ভানটি প্রয়োজন ছিল লক্ষ্মণকে ‘পরপুরুষ’ বলার জন্যে। আর পরপুরুষ হয় অন্দরমহলে আসার জন্যে তাঁকে তিরষ্কার করার জন্যেও। নবনীতার গল্পে ঊর্মিলা আসলে এই কাজের মাধ্যমে লক্ষ্মণকে প্রশ্ন করেন অধিকার বোধের। একজন নারীকে যোগ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার, তাঁর জীবনকে ওলোট-পালোট করার অধিকার লক্ষ্মণ কোথা থেকে পেলেন? নবনীতার রামায়ণে ঊর্মিলার অনুচ্চারিত প্রশ্নের সঙ্গে মিশে যায় দ্রৌপদীর প্রশ্ন। নবনীতা দেব সেনের গল্পে ঊর্মিলা কিন্তু রামায়ণের ঊর্মিলার মত সীতার অশ্রুজলে মুছে যান না। বরং নিজের প্রাপ্য সম্মান, ভালোবাসা যা এত দিন তিনি পাননি তার উত্তর চেয়ে লক্ষ্মণকে প্রশ্ন করেন। এই ভাবে নবনীতার হাতে ঊর্মিলা বাংলা সাহিত্যে পুনঃনির্মিত হন।

শূর্পনখা

রামায়ণে শূর্পনখা একজন রাক্ষসী হিসেবে পরিচিত হলেও নবনীতা দেব সেনের ‘রাজকুমারী কামাবল্লী’ গল্পে শূর্পনখা একজন স্বাধীন, সবলা, মুক্ত রমণী। যে নিজের পরিচয় নিজেই তৈরি করেন। নিজের পছন্দের পাত্রের প্রতি প্রেম নিবেদন করতেও পিছপা হন না। কিন্তু যখনই একজন নারী হয়ে শূর্পনখা বিয়ের প্রস্তাব দেন নিজের ভালোলাগার কথা জানিয়ে তখনই সেই নারীর দেওয়া বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ‘আর্য’, ‘বীর’, ‘রাজপুত্র’ লক্ষ্মণ বলেন-

> থাম, থাম, রাক্ষুসী, ঢের হয়েছে বেহায়পনা। য্যাঃ য্যাঃ –ভাগ।...স্ত্রীলোকের আবার কামজ্বর! এটা কেবল পুরুষের অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝলি, পৌরুষ জনিত ব্যাধি। ঠিক ব্যাধিও বলব না, বংশ বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। নারীর আবার ওসব কী?।[১৬]

এখানে লক্ষ্মণের উক্তির মধ্যে মিশে থাকে পৌরুষের দম্ভ এনং নারীদের প্রতি হীন মনোভাব। নারী শরীর নিয়ে নারীর সচেতনতা পুরুষের ভালো লাগে না। কারণ তাঁরা জানেন এই শরীর নারীর হয়েও নারীর নয় বরং পুরুষের বীজ বপনের ক্ষেত্রভূমি। তাই নারী হিসেবে শিক্ষিত স্বাধীন নিজের কামনা বাসনা সম্বন্ধে সচেতন এবং সেই নিয়ে কথা বলতে লজ্জিত নয় এমন মেয়েরা হলেন লক্ষ্মণের ভাষায় ‘টেটিয়া স্ত্রীলোক’। লক্ষ্মণকে অন্য গল্পে রামের তুলনায় অনেকটা অনুভূতিশীল ভাবা হলেও তাঁর আসল রূপ তিনি নিজেই নিজের অজান্তে প্রকাশ করে ফেলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মুখপাত্র হয়ে। এখানে একজন পুরুষ হয়ে নারীকে নিজের অবশ্যকর্তব্য কিছু কাজ বলে দেন লক্ষ্মণ-“তোর তো দিব্যি গতর আছে যা গিয়ে আমসত্ত্ব দে, বড়ি দে, আচার, পাঁপড় তৈরি কর কাম জ্বর সেরে যাবে।”[১৭] তাই বোঝা যায় পুরুষতন্ত্রের

শেখানো লিঙ্গভূমিকা পালন না করে প্রথাগত নিয়ম ভেঙ্গে যে মেয়েরা বাইরে আসতে চান তাদের সমাজ ভালো চোখে দেখে না। তাঁদের অবাধ্যতার জন্যে বরাদ্দ হয় শাস্তি । সেই শস্তি যা লক্ষ্মণ দিয়েছিল শূর্পনখাকে নাক কেটে। 'নাক উঁচু' কথাটির অর্থ অহংকার বা গর্ব বোধকরা তাই নাক কাটা মানে সেই অহংকারে আঘাত দেওয়া। তার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর নারীদেহের সৌন্দর্য এবং মুখশ্রী নষ্ট করার মধ্যমে তাঁর নারী শরীরে খুঁত তৈরি করা। লক্ষ্মণ শুধু শূর্পনখার অঙ্গহানি করেনি এই জাতীয় শাস্তি অয়োমুখীকেও দেয় তাঁর স্তনহানি করে। আসলে নারীদের শাস্তি দেওয়ার ধরণের মধ্যে পুরুষের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীত্বকে অপমান করার প্রয়াসই প্রধান হয়ে ওঠে।

নারীদের নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা দেখানো মহাকাব্যের একটি ধরণ। মধ্যযুগের সাহিত্যও এর উত্তরাধিকার বহন করে। কিন্তু মহাকাব্যের নারীদের নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে নবনীতার গল্পে মেয়েরা নিজেরদের মধ্যে বিবাদ-বচসা করেন না। কারণ নবনীতা জানেন এইটাও পুরুষতন্ত্রের একটা খেলা। পুরুষতন্ত্র মেয়েদের দু'ভাগ ভাগ করে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী, রাক্ষসী-রাজকুমারী, ভদ্র-অভদ্র ইত্যাদি বিপরীত যুগ্মকে। এবং ভালো এবং মন্দের সংজ্ঞা নির্মাণ করে কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে তাদের চিহ্নত করা হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখা যায় সতী সীতাকে রাক্ষসী শূর্পনখা খেতে চাইছে কারণ সীতাই হচ্ছে রামকে পাওয়ার পথে প্রধান ব্যাঘাত-

বদন মেলিয়া যায় সীতা গিলিবারে।

ত্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসের ডরে।।

যেই দিকে যান সীতা সেই দিকে রাক্ষসী।

রাক্ষসীর দরে কাঁপে জানকী রূপসী।। [১৮]

নবনীতার গল্পে যেহেতু রাণী থেকে রাক্ষসী সকলেই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা প্রতারিত তাই তাঁর গল্পে সীতা এবং শূর্পনখা একে অন্যের কষ্ট বুঝতে পারেন। শূর্পনখার রক্তপাত হলে সীতা তাঁর হাতে কাপড় বেঁধে দেন। পরিবর্তে শূর্পনখা রাম এবং লক্ষ্মণের যে স্বরূপ সে দেখেছে তা সীতাকে জানিয়ে দিতে ভোলেন না। ভগ্নীর প্রতি আর এক ভগ্নী বলেন-"জীবনে যদি সুযোগ আসে, এই প্রতারক রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা কোরো না। নতুবা নিজেই ঠকবে।"[১৯] এভাবেই নবনীতা তাঁর গল্পে পুরুষতন্ত্রেই চেনা ছকে চিড় ধরান। আর্য এবং অনার্য নারীদের মধ্যেও তৈরি হয় ভগিনীবোধ (sisterhood)।

গঙ্গা ও সত্যবতী

নবনীতা দেব সেন তাঁর 'অথ গঙ্গা-সত্যবতী কথা: অথবা সতীন সংবাদ' (২০০১) গল্পে দুই সতীন সত্যবতী এবং গঙ্গাকে মুখোমুখি বসিয়ে নির্মাণ করেন এক নারী পরিসর। গঙ্গা এবং সত্যবতী এই দুই সতীনের কিছু সিদ্ধান্তই বিষেশত সত্যবতীর পিতার সর্তেই ছিল মহাভারতের গল্পের আসল বীজ। সেই শর্ত নিয়ে আবার আলোচনা করতে গিয়ে সত্যবতী জানালেন আসল দোষ মহারাজ শান্তনুর। তিনি একজন রাজা হয়েও যোগ্য জেষ্ঠ্যপুত্রকে বিবাহ না করার প্রতিজ্ঞায় রাজি হয়েছিলেন শুধু মাত্র কামতাড়িত হয়ে সত্যবতীকে পাওয়ার জন্যে। এখানে তাঁর মহারাজ পরিচয় দলিত হয়েছে কামুক পরিচয়ের পায়ে। তাই গঙ্গা যতই সত্যবতীকে দোষারোপ করুক না কেন সত্যবতী এই কঠিন সত্যকেই গল্পে তুলে ধরেন। গঙ্গাও এই সত্য স্বীকার করে বলেন-"কামার্ত পুরুষকে দিয়ে মাতৃহত্যা পিতৃহত্যা পর্যন্ত করিয়ে নেওয়া যায়। পুত্রের স্বার্থনাশ

তো তুচ্ছ।"[২০] এভাবেই নবনীতার গল্পে নবনীতা নির্মাণ করেন নারীদের। যারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে না পরিবর্তে বুঝতে চেষ্টা করেন সেই বিবাদ করার প্রকৃত কারণকে।

অম্বা

'অম্বোপাখ্যান' গল্পে দেখি এমন একটি চরিত্র নিয়ে নবনীতা দেব সেন গল্প লিখছেন যে চরিত্র নিয়ে খুব আলোচনা হয়। অম্বার স্বয়ংবর সভা থেকে ভীষ্ম তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় তাঁর ভাইদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে। ভীষ্মের মহানতার চাদরে আড়াল হয়ে যায় এই ঘটনা। তবে অম্বা যখন সেই বিবাহ না করেই ফিরে আসেন তাঁর পুরানো প্রেমিক শাম্বর কাছে তখন সেই প্রেমিক তাকে গ্রহণ করতে রাজি হন না কারণ সে পর পুরুষ দ্বারা অপহৃতা এবং দূষিতা। ভীষ্মের কাছে ফিরে গেলেও সে তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবেই বিভিন্ন পুরুষ দ্বারা অসম্মানিত এবং বঞ্চিত হন অম্বা। নবনীতা তাঁর লেখায় প্রতিশোধের কাহিনির মাধ্যমে অম্বা চরিত্রের পুনর্নির্মাণ করেন। এই গল্পটির আর একটা বৈশিষ্ট্য হল গল্পটি মহাভারতের হলেও রামায়নের উদাহরণ দেওয়া হয় এই গল্পে। নবনীতার লেখা অনেক গল্পতেই দেখা যায় রামায়ণ এবং মহাভারত মিশে যাচ্ছে। এর থেকে নবনীতা দেখান রামায়নের 'নরচন্দ্রমা' রামের উদাহরণ দিয়ে রামায়ণকে কীভাবে ব্যবহার করতে চলেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এই গল্পে অম্বা শাল্বর কাছে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রর্থনা জানান এবং বলেন সীতাকে রামের ফিরিয়ে নেওয়ার অনুষঙ্গ। তখন শাল্ব বলেন-"তুমি রামচন্দ্রের কথা তুলেছিলে, তিনিই তো সীতাকে বলেছিলেন না- 'নেত্ররোগীর সম্মুখে দীপশিখার মতো তুমি আমার তীব্র নেত্রপীড়ার কারণ হচ্ছো'-আমিও তোমাকে তাই বলছি, অম্বা।"[২১] সুতরাং নবনীতা দেখান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ

দুইভাবে ব্যবহার করে রামায়ণকে। একদিকে মেয়েদের জন্যে সীতার আদর্শ দ্বারা সতী নির্মাণ অন্যদিকে পুরুষ নারীকে বিনা অপরাধে বঞ্চিত করার জন্যে রামের উদাহরণ ব্যবহার করছেন।

মহাভারত নিয়ে নবনীতার গল্পের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম কারণ ভাবা যেতে পারে তাঁর গবেষণার বিষয় প্রধানত রামায়ণ তাই সেই নিয়েই তিনি বেশি লিখেছেন। সীতাকে নিয়ে এত গল্প থাকলেও দ্রৌপদীকে নিয়ে কোনো গল্প লিখলেন না এইটা কিছুটা আশ্চর্যজনক। কিন্তু নবনীতা নিজে এই প্রশ্নের উত্তর দেয় তাঁর প্রথম খন্ডের ভূমিকাতে- "...'মুখর নৈঃশব্দ্য' গল্পটি ১৯৭৪-এ লেখা, 'দ্রৌপদী' নামে। প্রকাশ হয়েছে বহু বছর পরে, নাম বদল করে।"পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় এই নাম থাকলেও গল্পটি পড়তে অসুবিধা হত না। এই নিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর গল্প আছে। তার মানে দ্রৌপদীকে নামেও নবনীতা গল্প লিখেছিলেন।

মহাকাব্যের নারী চরিত্রদের পুনর্নির্মানের মধ্যে যেমন পুরুষতন্ত্রের প্রতি সমালোচনা থাকে তেমনি পুরুষ চরিত্রদের নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারাও তাঁদের নিজেদের সমালোচনা করান। এইটা নবনীতা দেব সেনের একাটা ধরণ। আর এই জন্যেই মহাকাব্যের নারী চরিত্রদের পুনর্নির্মাণ করতে বসে লক্ষ্মণ কে নিয়ে দু'টি এবং দুষ্মন্তকে নিয়ে একটি গল্প লেখেন। লক্ষ্মণ বা দুষ্মন্ত চরিত্রদের নিয়ে গল্প লিখে আসলে নবনীতা পুরুষদের দ্বারাই তাদের কৃতকর্মগুলো ব্যাখ্যা করান। 'লক্ষণের হাসি' গল্পে রাজসভায় অকারণে লক্ষ্মণ হেসে উঠলে রাজসভার সবাই হনুমান, সুগ্রীব, বিভীষণ, রাম এমন কি শিব নিজেই ভাবেন লক্ষ্মণ বোধ হয় তাকে নিয়ে হাসছেন। তাই হাসির কারণ বুঝতে গিয়ে সবাই সবার কুকর্ম গুলোর কথা মনে মনে ভেবে ফেলেন। এই ভাবনার সূত্রেই সবার মনের কথা শোনা হয়ে যায় পাঠকের। নবনীতা চরিত্রগুলোর স্বগোতক্তির মাধ্যমেই বোঝান তারা নিজেদের নিয়ে কী ভাবছেন এবং তারাও আসলে এমন অনেক কাজ করেছেন যা নিয়ে তাঁদের ওপর ও সমান ভাবে হাসা সম্ভব।

'অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম' গল্পে দুষ্মন্তকে নাজেহাল হতে দেখা যায়। সেখানে দুষ্মন্ত একজন কামুক, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী ও অসৎ প্রকৃতির রাজা। আর একটি বৈশিষ্ট্যও কিন্তু নবনীতার কল্পিত নয়। আসলে কাহিনির মধ্যেই যে অব্যক্ত কথা লুকিয়ে থাকে বা বলা ভালো পুরুষ প্রধান সমাজ যে দিক গুলোয় আলোকপাত করেন না সেই দিক গুলো নবনীতার গল্পে প্রধান হয়ে ওঠে। তার জন্যে হয়তো নবনীতা কল্পনারও আশ্রয় নেন। মূল গল্পকে পরিবর্তন না করেও নবনীতা দেখিয়ে দেন অভিজ্ঞানের অভাবে যে ভাবে অপমানিত হতে হয়েছিল শকুন্তলাকে সেই ভাবে দুষ্মন্তকেও প্রজাদের কাছে অপমানিত এবং প্রহৃত হতে হয়। তাই শকুন্তলার প্রতি হওয়া অবিচারের স্বাদ একবার দুষ্মন্তকে অনুভব করান নবনীতা দেব সেন তাঁর গল্পে।

নবনীতা দেন সেনের লেখা পুরাণের পুনঃকথনের গল্পগুলো প্রধানত কৌতুকের আবরণে লেখা। নবনীতা দেব সেন তার গল্পে পুরাণ ও মাহাকাব্যের নানা ঘটানার পুনর্নির্মাণ করে আমাদের প্রশ্ন করতে শেখান। শুধু প্রশ্ন করতে শেখান না উত্তর খোঁজার পদ্ধতিও বলে দেন। মহাকাব্যের যে কাহিনি এতদিন ধরে জেনে বুঝে শিখে এসেছি তাকে যুক্তি-বুদ্ধি-মনন দ্বারা যাচাই করে তার পরই তাকে বিশ্বাস করতে শেখান নবনীতা। আর প্রয়োজন পড়লে প্রথাগত সংস্কার যা আমাদের নতুন করে ভাবতে বাধা দেয় সেই শিক্ষাকে "un-learn" করতেও শেখান তিনি। মহাকাব্যের যে আদর্শ দ্বারা, যে নীতি দ্বারা আমাদের ধর্মীয় এবং নৈতিক জীবন গড়ে উঠেছে সেটাই যে মহাকাব্যের এক এবং একমাত্র পাঠ নয়; আমরা চাইলে ঐতিহ্যকে অসম্মান না করেও যে বিকল্প পাঠ নিজেদের মত করে করতে পারি সেই সম্ভবনাকে বিশ্বাস করতে শেখান নবনীতা। সবশেষে বিকল্প সম্ভবনা, উত্তরহীন কিছু প্রশ্নকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করে সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। তাঁর হাতে মহাকাব্যের চরিত্ররা যুগোপযোগী হয়ে ধরা

দেয় পাঠকের চিন্তায়। এভাবেই মহাকাব্যের নারী চরিত্রদের পুনর্নির্মাণ করেন নবনীতা দেব সেন। কল্পনাকে এবং কৌতুককে ব্যবহার করেন বিকল্প রচনার জন্যে।

তথ্যসূত্র :

১ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ আগষ্ট ২০১৭ পৃষ্ঠা ২০৯

২ নবনীতা দেব সেন, *চন্দ্র-মল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২২, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯

৩ http://www.manushi.in/docs/906-when-women-Retell-the-ramayan.pdf

৪ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ আগষ্ট ২০১৭ পৃষ্ঠা ২০৯

৫ তদেব

৬ তদেব

৭ তদেব পৃষ্ঠা ২১৭

৮ তদেব পৃষ্ঠা ২১৮

৯ দেব সেন, নবনীতা, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৪*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১ পৃষ্ঠা ১১১

১০ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ আগষ্ট ২০১৭ পৃষ্ঠা ২৩২

১১ তদেব পৃষ্ঠা ২৮৬

১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*প্রাচীন সাহিত্য,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, শ্রাবন ১৪২২, পৃষ্ঠা ৭৩

১৩ কৃত্তিবাস, *রামায়ন* , হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪২৭

১৪ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৪*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১ পৃষ্ঠা ১০০

১৫ তদেব পৃষ্ঠা ১০১

১৬ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ আগষ্ট ২০১৭ পৃষ্ঠা ২২৬

১৭ তদেব

১৮ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *রামায়ন কৃত্তিবাস বিরচিত*,সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৩৫

১৯ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ আগষ্ট ২০১৭ পৃষ্ঠা ২২৯

২০ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৪*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১ পৃষ্ঠা ১১৫

২১ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র* , দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ আগষ্ট ২০১৭ পৃষ্ঠা ২৪৯

তৃতীর অধ্যায়

নবনীতা দেব সেনের গল্পে সমাজ ও নারী

নবনীতা দেব সেন তাঁর মহাকাব্যের নারীচরিত্রদের নিয়ে গবেষনাধর্মী লেখা থেকে শুরু করে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ সব লেখাতেই দেখান, সীতার থেকে যে কাহিনির সূত্রপাত হয়েছে তা আজও চলছে। *সীতা থেকে শুরু* গল্পগ্রন্থের নামকরণ থেকেও লেখকের এই বক্তব্যটি প্রমাণিত হয়। কিন্তু একথা সর্বজনগ্রাহ্য বিশ শতকের শেষে দ্রুত পরিবর্তিত হওয়া সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মেয়েদের অবস্থার অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে তাদের যোগদান বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্য রচনাতেও অনেক মেয়েরা নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন। তাহলে তো আপাতভাবে মনে হতেই পারে, মেয়েদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম হচ্ছে, তাঁরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হচ্ছে। আর সেই কারণেই একুশ শতকে গিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন হয়ে উঠছে এক স্বপ্ন পূরণের কাহিনি। কিন্তু এই উন্নতির কথা জেনেও নবনীতা দেব সেন তাঁর তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজের যে প্রান্তেই দেখেন বুঝতে পারেন নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর গুণগত কোনও পার্থক্য হয়নি। তাই সমাজে শিশুকন্যা হত্যা, নারীর যোগ্য সম্মান না পাওয়া, লিঙ্গবৈষম্য, নারী নির্যাতন এমনকি সমাজের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের অধিকার অর্জনের লড়াই সমানভাবেই বিদ্যমান। তবে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে এই সমস্যাগুলির বাহ্যিক পরিবর্তন হয়েছে বা বলা যায় সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমস্যাগুলি আরো জটিল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

নবনীতা দেব সেন তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে এই সামাজিক সমস্যাগুলির নানা স্তর উন্মোচন করেন। তাই কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে নবনীতার মতামত বুঝতে গেলে প্রয়োজন নবনীতা দেব সেনের সেই বিষয় নিয়ে লেখা বিভিন্ন গল্পগুলোর একসঙ্গে আলোচনা। বিষয় অনুযায়ী কয়েকটি বিভাজনের মধ্য দিয়ে এই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

নারীর প্রতি অবদমন শুরু হয়ে যায় জন্মলগ্ন থেকেই। মা নিজে একজন নারী হয়ে নিজের গর্ভে ধারণ করেন ভবিষ্যতের এক নারীকে, সেই মায়ের কাছেও যখন কন্যা সন্তান অনাহূত তখন খুব সহজেই বোঝা যায় এই কন্যাসন্তানের প্রতি এই বিতৃষ্ণা আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ দ্বারা নির্মিত। যে সমাজে নারীর মর্যাদা নির্ধারিত হয় বস্তুমূল্যে সেই সমাজে কন্যা মানে অর্থের নির্গমন আর পুত্র হল অর্থ উপার্জনের উৎস এবং একই সঙ্গে বংশরক্ষার উপায়। তাই যুগ যুগ ধরে কন্যাশিশুদের জন্ম মাত্রেই তাদের ভাগ্যে জুটেছে অবহেলা। আর এই যুগসঞ্চিত অবহেলাকে দূরে সরিয়ে শিশুকন্যাদের প্রতি সচেতনতা তৈরীর জন্যে 'সার্ক' দেশগুলিতে ১৯৯০ সালকে চিহ্নিত করা হল 'শিশুকন্যাবর্ষ' রূপে।[১] পরে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই কার্যক্রমকে বিস্তৃত করা হয়। কিন্তু এত বিশ্বব্যাপী সচেতনতার প্রেক্ষাপটে শিশুকন্যাদের প্রতি ঔদাসীন্য নিয়ে ২০০০ সালেই নবনীতা লিখেন 'শিশুকন্যা দশক' নামক গল্পটি। গল্পে নবনীতা দেখান শিশুকন্যাদের নামে দশকের নামকরণ করে দেওয়া হলেও শিশুকন্যাদের প্রতি সমাজের মনোভাবের কিছুই পরিবর্তন হয়না। এই গল্পে জানা যায় এমন এক নারীর কথা যাকে পুত্র উৎপাদনের জন্যে একাধিক বার গর্ভধারণ করতে হয়। কখনও কখনও একই বছরে হয়তো দুবার। তাই তৃতীয় সন্তান কন্যা হলে সেই সন্তানটিকে তাঁর মা নিজে হাতে ডেটল দিয়ে হত্যা করে। আবার চতুর্থ সন্তানটিও যখন মেয়ে হয় তখন সেই নিরুপায় মা সন্তানটিকে হাসপাতালে ফেলে রেখেই নিখোঁজ হয়ে যায় কারণ মেয়ে সন্তান চায়না তার পরিবার। কী পরিমাণ মানসিক এবং সামাজিক চাপ থাকলে একজন মা তাঁর শিশুকে হত্যা করতে বাধ্য হয় বা তাকে পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আসলে কন্যাশিশু জন্মের জন্যে দায়ী করা হয় মা কে। কিন্তু বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত এই ধারণা কতটা ভুল। সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্যে পুরুষটি প্রধান ভূমিকা নেয়। কিন্তু পুরুষরা এই সত্য মেনে নেয় না তাই নারীদের উপর ভুল

ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় সব দায়। সমাজের এই রূঢ় বাস্তবতা ফুটে ওঠে নবনীতার লেখায়। গল্পের শেষে কথক বলেন-

> ক্যালেন্ডারে সহস্রাব্দ শেষ হইতে চলিল একবিংশ শতক দুয়ারে কড়া নাড়িতেছে। নারীবর্ষ, নারীদশক কবেই শেষ। কন্যাশিশুবর্ষ, কন্যাশিশুদশকও ফুরাইতে চলিল। পৃথিবী জুড়িয়া কন্যা শিশুদের নিয়ে আলোচনা, উৎসব, চিন্তা-ভাবনা চলিতেছে, কত পরিকল্পনা। সেই বউটি খোঁজ পাই না আর![২]

খাতায়-কলমে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তার সুফল আজও পৌঁছয় না সমাজের সমস্ত স্তরে। তাই এই বউটির মত অনেক বউকে নিরুদ্দেশ হতে হয় কখনও বেছে নিতে হয় আত্মহত্যার পথ। নবনীতা তাঁর গল্পের মাধ্যমে আরো একটি প্রশ্ন করেন তা হল আপাত ভাবে কন্যাটিকে হত্যা তাঁর নিজের মা করলেও এই হত্যার জন্যে প্রকৃত দায়ী কে? বিশ্ব সচেতনতার প্রেক্ষাপটে নবনীতা যখন মেয়েটির মা'কে দাঁড় করান, তখন উঠে আসে এক আলাদা চিত্র। এই একই প্রসঙ্গ আসে মল্লিকা সেনগুপ্তের লেখা *কন্যাবর্ষে* কবিতাটি। যেখানে মল্লিকা সেনগুপ্ত আশায় বুক বাঁধেন —

> তার প্রতিবাদ হোক আমার জরায়ু
> আসুক আমার মধ্যে প্রতিভূ আমার
> তুলতুলে অথচ স্বাধীন
> ছোট্ট একটি শিশু কন্যা।[৩]

কিন্তু নবনীতা দেব সেন তাঁর একাধিক গল্পে তুলে ধরেন শিশুকন্যাদের করুণ পরিণতির নিদারুণ চিত্র। যা শুধু শিশুকন্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কন্যা সন্তানের জন্মের পর তাঁর মায়ের পরিণতি নিয়ে লেখা আর একটি গল্প হল *পরীর মা*। গল্পটি শুরুই হয় ললিতার বহু

কামনার ধন সদ্য জন্মানো শিশু পুত্রসন্তানের পুরুষাঙ্গ দেখে। এই ভাবে গল্প শুরুর মাধ্যমেই নবনীতা বুঝিয়ে দেন এই অঙ্গটির প্রয়োজনীয়তা শুধু গল্পেই নয় সেই শিশুপুত্রের মা ললিতার জীবনেও কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ললিতা পুত্রসন্তান প্রসব করলেও তার বদলে তাকে এক কন্যাসন্তান এনে দেন নার্স। বলা বাহুল্য, নার্সটি এক নিন্দনীয় কাজটি করেন এক গুজরাটি দম্পতির দেওয়া টাকার বিনিময়ে। টাকার মূল্যে সেই ধনী দম্পতি ছেলে কিনতে চায়, পরিবর্তে তাদের 'ডলপুতুলের' মত মেয়েকে অন্যের কাছে দিয়ে দিতেও তাদের বাধে না। সন্তান হিসেবে ডলপুতুলের মত মেয়ের থেকেও কালো কালো ছেলের দাম বেশি কারণ সেই পুরুষাঙ্গ! শিশুপুত্রের এই অঙ্গটি সমাজে এবং পরিবারে তাকে বেশি প্রয়োজনীয় করবে শুধু তাই নয় বর্তমানে তাদের মায়েদের সুখে এবং সম্মানে বাঁচারও একমাত্র অবলম্বন হবে। গল্পের শেষে দেখা যায় ললিতার যে স্বামী পুত্র সন্তানটির জন্যে উদগ্রীব ছিলেন সেই স্বামীই নিজের পুত্র দিয়ে অন্যের মেয়ে নিতে রাজী হয় টাকার বদলে। মানে এখানে ললিতার স্বামীর কাছে নিজের সন্তান হিসেবে ছেলে এবং মেয়ে নয় আসলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয় টাকা। যখন মেয়ে নিলে টাকা বেশি আসবে তখন ছেলে চাওয়ার দাবী তলিয়ে যায় টাকার অঙ্কের কাছে। আর গুজরাটি দম্পতির টাকার বিনিময়ে পুত্র সন্তান কেনার মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় বিত্তের পরিবর্তন মানসিকতার পরিবর্তন করতে পারে না। তাই এই সব নোংরামোর বিপরীতে মায়ের ভালোবাসা নিয়ে যারা খেলেন তাদের সবার প্রতি যোগ্য জবাব দেন পরীর মা। গল্পের শেষে দেখা যায় পরীকে তাঁর নকল মা-ই পালন করেন এবং তার জন্যে তাঁর স্বামীর ঘর ত্যাগ করতেও সে পিছপা হয় না। পরীর মা বলেই সে নিজের পরিচয় দেয়, গল্পের নামকরণও হয় সেই নামে। এই বিষয় নিয়ে গল্প লিখে নবনীতা দেব সেন যেমন সমাজের বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেন তেমনই মাতৃত্বে, একের অন্যের প্রতি ভালোবাসায় এবং মানবিকতার বিশ্বাস হারাতে দেন না ।

মেয়েদের শিক্ষিত হয়ে নিজেদের আত্মপরিচয়ে পরিচিত হওয়া যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নবনীতা দেব সেনের লেখায় ঘুরে ফিরে আসে। *গদাধরপুর উইমেন কলেজ* মেয়েদের নিয়ে লেখা গল্প। সমাজে একটি বিবাহিত মেয়ে আর অবিবাহিত মেয়ের সামাজিক অবস্থানের প্রবল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নবনীতার গল্পে বিবাহিত আর অবিবাহিত বিভাজনকে অতিক্রম করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কর্মরত আর কর্মহীন এই দুটি পরিচয়। প্রথমে উচ্চপদস্থ স্বামীর স্ত্রী হয়ে যে নারী তাঁর বন্ধুকে বলেন- "ওটা কি একটা লাইফ হল গীতু?"[৪] পরে সেই উচ্চপদস্থ স্বামীর স্ত্রী-ই তাঁর বন্ধু গীতুকে বলেন-"ওহ, কর্তার কথা ছাড়। তাঁর বেয়ারা বাবুর্চি সবাই আছে- আমি তো একটা ফাউ। কর্তা বোধ হয় টেরও পাবেন না মেমসাহেব কলকাতা মে, ইয়া গদাধরপুর মে!...সত্যি রে, ফিলসফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে?'[৫] গল্পটি শেষ হয় আয়রনি দিয়ে। গীতু নিজের পদমর্যাদা অধিকার করে নিতে সক্ষম হয়, এদিকে অন্যের পদমর্যাদা যে কখনো নিজের হয় না সেই সত্যটাই ফুটে ওঠে এই গল্পের মাধ্যমে। গল্পে আর একবার নবনীতা দেখান নারীজীবনের সার্থকতা স্বামী এবং সংসার করেই শুধু নয় বরং সেই কাজ করে যা তাকে এক জন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবে। যে পরিচয় হবে তাঁর নিজের, কেউ চাইলেই যে পরিচয় কেড়ে নিতে পারবে না ।

বাঙালি সমাজে বিয়ে নিয়ে প্রচলিত নানা নিয়ম-চিন্তা ভাবনা পাওয়া যায় নবনীতা দেব সেনের গল্পে। বিবাহ হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। দেশ-কাল-সমাজ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় বিয়ে সংক্রান্ত মানুষের ধারণা। তেমনই বাঙালি সমাজের বিয়ের প্রথাগত এবং প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ছেলেরা মানে পাত্ররা 'বিয়ে করে' আর পাত্রীদের 'বিয়ে হয়' বা 'বিয়ে দেওয়া হয়' বা পাত্রীরা 'বিয়েতে বসে'। শব্দ ব্যবহার দিয়েই বোঝা যায় একপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় আর এক পক্ষ

তা মেনে নেয়। তা ছাড়াও বিয়ের ক্ষেত্রে মিলিয়ে দেখা হয় ধর্ম, জাত, বিত্ত, রূপ এবং বয়েস। নবনীতার গল্পে বিয়ে নিয়ে নানা প্রসঙ্গ আসে। বলাবাহুল্য নবনীতা এই প্রসঙ্গকে নিয়ে গল্প লিখে আসলে দেখাতে চান বিয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সব মাপকাঠি, এককই আসলে সমাজ দ্বারা নির্মিত। দুজন মানুষের এক সঙ্গে সুখে থাকার জন্যে এগুলো কোনোটিই প্রায় আবশ্যক নয়। তাই নবনীতা যেমন এক দিকে সমাজে প্রচলিত ধারণা গুলোকে নস্যাৎ করেন তাঁর লেখার মাধ্যমে তেমনই নির্মাণ করেন নানা বিকল্প সম্ভবনা। প্রায় সব কটি গল্পেই এই ধরণটি লক্ষ্য করা যায়। 'পরিণয়ে প্রগতি' গল্পে দেখি টোটো-শোহিনীর বিয়ে হয় সমাজের প্রথাগত ধারণা ভেঙে। এই গল্পে টোটোর বিয়ের জন্য পাত্রী ঠিক করতে গিয়ে নানা মানসিকতা সম্প পাত্রীর পরিচয় করিয়ে তারপর নবনীতা দেখান টোটো নিজেই নিজের পাত্রী পছন্দ করে নেয়। যে টোটোর থেকে বয়সে বড় এবং হিন্দু নয়, বৌদ্ধ। বাঙালি নয়, অসমিয়া। সমাজে প্রচলিত বিয়ের ধারণাকে এইভাবেই নবনীতা ভ্রান্ত প্রমাণ করেন এবং দেখান দুটি মানুষের মনের মিলই প্রধান। বাকি সবই আসলে বাহ্যিক, আরোপিত। টোটো-শোহিনীর বিয়ে দিয়ে নবনীতা দেব সেন সামাজিক প্রথাগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করতে শেখান।

আবার বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকা অর্থাৎ 'লিভ ইন' বাঙালি সমাজ কীভাবে দেখছে তার খুব সংবেদনশীল ছবি পাওয়া যায় 'দেশের চিঠি'(১৯৯৩) গল্পে। আঙ্গিকে চিঠি হলেও এটি আদতে ছোটোগল্প। পাত্রীর মা প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী একজন মানুষ হলেও মেয়ের কথা ভেবে তিনি এই সম্পর্ককে বুঝতে চেষ্টা করছেন। কিছুটা মেনে নিয়ে আর বাকিটা নতুন ধারণাগুলোকে বুঝতে চেষ্টা করে এই গল্প হয়ে উঠছে দুটি ধারণার সহাবস্থানের কাহিনি। গল্পে পাত্রীর মা মেনে নিলেও বিদেশী জামাইয়ের কথা পাত্রীর পিতা নেমে নিতে পারছেন না। তাই জন্যেই মা এখানে তাঁর মেয়েকে বোঝাচ্ছেন তাঁর বাবার এই মানতে না পারাটা আসলে

একান্তই নিজস্ব সমস্যা। বিয়ে নিয়ে সমাজের প্রচলিত প্রায় সব ক'টি ধারণাকে ছুঁয়ে নবনীতা সেই মায়ের বয়ানে বলেছেন—"আমাদের কান মন প্রাণ, তিনটেকেই যে আমরা সংস্কারের গামছা জড়িয়ে "কানামাছি ভো ভো করে বেঁধে রেখেছি।"[৬] এইভাবেই নবনীতা বহুযুগের প্রচলিত সংস্কারগুলোকে অন্ধভাবে বিশ্বাস না করে যুক্তিদ্বারা সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী মিলিয়ে দেখতে বলেছেন।

বিয়ে নিয়ে যেমন নবনীতা দেব সেন একধিক গল্প লেখেন বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক, বিবাহবিচ্ছেদ প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে বুঝে দেখার প্রচেষ্ঠা আছে তাঁর নানান গল্পে। 'বামুন মুচি রাজা'(১৯৯৫) নবনীতার লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প। গল্পের বিষয় হল একাধিক বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে থাকা এক বহুগামী পুরুষের নিজের মুখে তার কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি। একজন পুরুষ বহু নারীকে কী কী ভাবে ঠকায় সেই কাহিনি পুরুষটির দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নবনীতা গল্পটিতে বলান। গল্পে পুরুষটি জয়া, হাসমৎ, তমসা এই তিন জন নারী যাঁরা তাকে ভালোবেসেছে তাঁদের কোনো না কোনো সময়ে ঠকিয়েছেন। কিন্তু এই খানেই শেষ নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আসলে নারীর কাছে আশা করে আনুগত্য, অন্ধ বিশ্বাস। তাই এতদিন ধরে চলে আসা নিয়ম মেনে পুরুষ আশা করে তার প্রিয় একনিষ্ঠ নারীটি বুঝবে পুরুষের বহু নারীর প্রয়োজনীয়তা। এখানে পুরুষ বয়ানকে ব্যবহার করে নবনীতা দেব সেন গল্পের চরিত্রটিকেই শুধু নয়, তার মত মানসিকতা সম্পন্ন আরও পুরুষদের তীক্ষ্ম সমালোচনা করে।

সমাজ নারী-পুরুষের লিঙ্গ ভূমিকা নির্মাণ করে সম্পর্কের মধ্যে যে সমীকরণ হবে তা ঠিক করে দেয়। সেই ধারণাকে মানুষমাত্রেই বিশ্বাস করে নেয়। সেই ধারণা এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন মা এবং সন্তানের সম্পর্ক হল সবথেকে বিশুদ্ধ, কিন্তু সৎমা মাত্রেই খারাপ মানুষ এই হচ্ছে সমাজে প্রচলিত ধারণা। আর সমাজের এই ধারণাকে

ভুল প্রমাণ করেন নবনীতা দেব সেন তাঁর লেখা 'বিমাতা'(২০০২) গল্পে। এই গল্পে দেখা যায় এক পুরুষ বিবাহ করে স্ত্রীকে দেশে রেখে পাড়ি দেয় বিদেশে। শুধু তাই নয়, সেখানে গিয়ে আবার এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর পুত্র সন্তান হয়। সুতরাং পুরুষটি আসলে প্রতারিত করেছে দুটি নারীকে সমান ভাবেই। কিন্তু লোকটির প্রথম স্ত্রী তার বিদেশী সতীনের ছেলেটিকে বিদেশ থেকে নিয়ে এসে মানুষ করেন নিজের পরিচয়ে।""...সাগর যদি তাপসীর সতীন পুত্তর হবে, তাহলে তাপসীও সাগরের সৎমা। তাপসীকে যদি সৎমা বলি, মা তবে আর কাকে বল্ব?""[৭] যে সমাজে বিমাতা মাত্রেই খারাপ ভাবা হয়, নবনীতা তাঁর গল্পে প্রমাণ করলেন যে বিমাতা মাত্রেই খারাপ হয় না। প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, নবনীতা দেব সেনের মা রাধারাণী দেবীরও 'বিমাতা' (১৯২৪) নামে একটি গল্প আছে।[৮] যেখানে তিনি লিখেছিলেন মাধুরী নামের একটি মেয়ে এবং তার সৎ ছেলেকে নিজপুত্র স্নেহে ভালোবাসার কাহিনি। যখন পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছেলেটিকে বলছে যে তার আসল মা স্বর্গে গেছে, তখন বোঝা যাচ্ছে সমাজ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বিমাতা মাত্রেই 'আসল' মা নয় বরং আসলের বিপরীতে নকল মা।বলা বাহুল্য, এই ধারণা দ্বারা সমাজের একটা ব্যাপক অংশ প্রভাবিত। গল্পদুটির মধ্যে এত মিল তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্পষ্ট হয়ে যায় নবনীতা দেব সেন এই মুক্তমনা মানুষ হতে পেরেছেন রাধারাণী দেবীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই। দুজনেই একই নামে গল্প লিখছেন এবং প্রমাণ করছেন সমাজ নির্মিত সমীকরণের বাইয়েও সম্পর্ক গুলোকে ভাবা যেতে পারে।

ঠিক একই ধারণা থেকে নবনীতা আগেই একটা গল্প লিখেছিলেন 'ভাসানির মা' (১৯৯৯)। গল্পটি খবরের কাগজের পাতা থেকে পাওয়া একটি প্রতিবেদন অবলম্বনে লেখা। যে ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৯ সালের ১০ জুন। খবরের অংশটি ছিল —

...কাকিমাকে রক্ষা করতে গিয়ে খুনি যুবক ভাসানি রায়ের দুই দাদা শান্তিগোপাল ও বিধান গুরুতর আহত হইয়া হাসপাতালে ভর্তি, শান্তিগোপালের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মা লক্ষ্মীরাণী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।[৯]

এই খবরটিকে নবনীতা বললেন, 'প্রাচীন কাহিনি'। ১০ জুন খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পরের সপ্তাহেই যখন নবনীতা গল্প লিখলেন, তখন সেই গল্পটি 'প্রাচীন; বলে প্রধানত বোঝাতে চাইছেন এমন ঘটনা যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে। তাই বিষয়গত ভাবে গল্পটি প্রাচীন। সম্পত্তির লোভে যখন নিজের ছেলে খুন করে মাকে, নবনীতা দেখান রক্তের সম্পর্ক নেই এমন মানুষেরাও প্রকৃত ভালোবাসা দিতে পারে। পুত্র কামনার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল বৃদ্ধ বয়সে সেই পুত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন হয় । কিন্তু নবনীতা দেখান পুত্র থাকেলই সে বাঁচার অবলম্বন হবে এমন ধারণা ভুলও হতে পারে। নবনীতা আসলে এই গল্পের মাধ্যমে সমাজের ঠিক করে দেওয়া সম্পর্কের প্রথাগত ধারণাকে ভাঙেন। নারীর প্রতি অবহেলা অবিচার যে শেষ বয়সেও থেমে থাকে না নবনীতা সেটা দেখান তাঁর গল্পে এবং তাঁর লেখা নভেলা 'শীত সাহসিক হেমন্তলোক' (১৯৮৮)ও দেখা যায় বয়স্ক নারীর জীবনে নানা টানাপোড়েন। ভাসানির মা গল্পটিকে আসলে পড়া যায় 'নারী' এবং 'বয়স' এই সম্পর্কের সমীকরণে। এই নভেলার আলোচনায় বলা হয় —

> Navaneeta Dev Sen is among the few writers attempting to give voice to a marginalized sector of the society by imitating a discussion of grossly neglect subject 'Women and age' in India.[১০]

নবনীতার সচেতন দৃষ্টি সমাজের সব প্রান্তে সমান ভাবে বিচরণ করে, সে কন্যাশিশু হোক বা বৃদ্ধা তাদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাকে নিয়েই নবনীতা গল্প লেখেন।

১৯৭১ সালে Medical Termination of Pregnancy Act (MTP) পাশ হলে গর্ভপাত আইনি হয় ভারতে। তবে গর্ভপাতকে তখনই 'Valid' এবং 'Acceptable' ভাবা হয় যখন শিশুসন্তানটি মারাত্মক ভাবে বিকলাঙ্গ হয়। অথবা গর্ভধারণে মায়ের শারীর এবং মানের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর যদি সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্যে মায়ের জীবন সংশয় হয়। এই সব ক্ষেত্রেই গর্ভপাত করা যেতে পারে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে।[১১] কিন্তু এই কারণ গুলো ছাড়াও আরো এমন অনেক কারণ থাকতে পারে যার ফলে সন্তানটির জন্ম দিতে মা প্রস্তুত নয়। সেই গুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় না এই আইনে। নারীবাদীরা এই সময়ে প্রশ্ন তোলেন কী করে বোঝা যাবে গর্ভপাত 'valid' কিনা আর 'acceptable' হলেও সেটা কার বা কাদের কাছে? এমনই একটি কারণের ওপর আলোকপাত করেছেন নবনীতা দেব সেন তাঁর 'পরভৃৎ' গল্পে। প্রকাশ কাল পাওয়া না গেলেও গল্পগ্রন্থের সূচনাকে নবনীতা জানান এই গল্প ১৯৭৪ পরবর্তী কোনো একটা সময়ে লেখা। নবনীতা একজন সচেতন মানুষ হয়ে আইনের এই দিকটা তাকে ভাবিয়েছিল তাই এই নিয়ে লিখে ফেললেন সৌমেন আর সরমার কাহিনি। বহু প্রত্যাশার সন্তান হলেও সরমা পড়ে জানতে পারেন তার স্বামী অন্য এক নারীর প্রতি আসক্ত। তাই শিশুটি যখন জন্ম নিচ্ছিল সরমার জারায়ুতে, তখন সৌমেনের চোখে ছিল অন্য এক নারীর স্বপ্ন। অন্যের প্রাপ্য বীজ সৌমেন গুঁজে দিয়েছে সরমার জরায়ুতে। আর এখানে সরমা প্রশ্ন তোলেন তাহলে এই সন্তান কি তাদের? কখনই না। এই সন্তান সরমার শরীরে থাকলেও এই সন্তান আসলে সৌমেন এবং তাঁর কল্পনায় থাকা নারীটির। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয়-"সংসারে পরের বাচ্চা মানুষ করা, ইস্কুলে পরের বাচ্চা মানুষ করা, আর আপন রক্তমাংসের ভেতরে পরের বাচ্ছা মানুষ করা, এক নয়।"[১১] এবং গল্পের শেষে গর্ভপাত কারানোর সিদ্ধান্ত নেন সরমা। নবনীতা দেখান

আইন প্রবর্তিত হলেও সেই আইনের মধ্যে ফাঁক থেকেই যায়। নবনীতা আর এক বার প্রমাণ করেন গর্ভপাত করানোর সিদ্ধান্ত শুধু উপরিউক্ত তিন কারণেই আবদ্ধ থাকতে পারে না। সেই কারণ গুলোর পাশাপাশি থাকতে পারে আরো সূক্ষ্ম কারণ। নারী মনস্তত্ত্বের নিখুঁত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নবনীতা তুলে ধরেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আর একটা নৃশংস দিক।

'ধর্ষণ' একটি সামাজিক অপরাধ। বিকৃত যৌন ক্ষুধা এবং পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা লিপ্সার এক জঘন্য বহিঃপ্রকাশ। ধর্ষণ নিয়ে নবনীতা দেব সেনের লেখা গল্পটি হল *বিন্ধ্যবাসিনী* (২০০২)। যেখানে নবনীতা এক ধর্ষিতা নারীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে গিয়ে যে সব প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় সেগুলোকে গল্পের আকারে বলেছেন। তার সঙ্গে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার খুব সূক্ষ্ম এবং সংবেদনশীল বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন শহুরে শিক্ষিত মানুষগুলো তাঁর ভালো করতে গিয়ে আদেও পারে না। একজন নারীকে ধর্ষিতা জানলে সমাজের মনোভাব সেই নারীর প্রতি অনেকটা পাল্টে যায়। বিন্ধ্যার 'ধর্ষিতা' পরিচয় তাঁর পিছু ছাড়ে না যতই সে সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে চায় না কেনো। হোম থেকে একটি বাড়িতে কাজের জন্যে নিয়ে গেলে সেই বাড়ির কর্তাটি তাঁর প্রতি বেশী যত্নবান হয়ে ওঠে ফলে বাড়ির গিন্নি বিন্ধ্যকে একশ টাকা হাতে দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। কাজের সূত্রে অন্য একটি বাড়িতে সে কিছুটা সুখে-শান্তিতে থাকলেও তার ধর্ষিতা পরিচয় তাকে আবার গৃহহীন করে। তথাকথিত শহুরে শিক্ষিত মানুষরাও যে নিজেদের পিছুটান কাটিয়ে উঠতে পারে না এই গল্প তারই প্রমাণ। লিঙ্গবৈষম্যে সম্পর্কে সচেতন এবং লিঙ্গ নিরপেক্ষতাই বিশ্বাসী মধ্যবিত্ত সমাজমন কখনো জেনে কখনো বা না জেনেই এমন অনেক আচরণ করে যা তার বিশ্বাসের বিপরীত। গল্পের শেষে তাই নবনীতা দেখান বিন্ধ্য এক বা একাধিক পুরুষের দ্বারা হয়ত ধর্ষিত কিন্তু

ধর্ষণ সেখানেই শেষ হয়ে যায় না কারণ দিনের পর দিন বিন্ধ্যরা ক্রমাগত ধর্ষিত হতে থাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থরক্ষায় তৈরী মূল্যবোধগুলোর দ্বারা।

নবনীতা দেব সেন খুব তীব্র ভাবে হয়তো নিন্দা করেন না বা বীভৎসতা দেখান না তাঁর লেখায় কিন্তু তাঁর ধরণই হল খুব সহজ অনেক গভীর কথা বলে দেওয়া। যেমন ধর্ষণ নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন 'দ্রোপদী' এবং নবনীতা দেব সেনের এই নিয়ে লেখা গল্প হল 'বিন্ধ্যবাসিনী'। যদিও দুটো গল্পের প্রেক্ষাপট আলাদা তবুও যে বীভৎসতা দেখা যায় মহাশ্বেতার গল্পে নবনীতার গল্পে তা পাওয়া দুর্লভ। ফলত মনে হতে পারে এই গল্প দাগ কাটলো না কিন্তু সচেতন পাঠক লক্ষ্য করবেন নবনীতা কিন্তু সেই ধর্ষিতা মেয়ের জীবনের প্রতিবন্ধকতা খুব সহমর্মিতার সাথে লেখেন। সমাজের ক্রূরতার কথা গভীর ভাবে বলে দেন নানা সমস্যার সঙ্গে মিশিয়ে।

সিমোন দ্য বোভোয়ার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Second Sex"-এ নারীদের সমাজে দ্বিতীয় লিঙ্গ বলেছেন। কিন্তু নারী পুরুষের দ্বৈত সত্তা ছাড়াও আরো এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা সমাজের এই নির্মিত দুটি ভাগে নিজের পরিচয় খুঁজে পাননা। তাই প্রথম দ্বিতীর লিঙ্গের পর তাঁরা হলেন সমাজের তৃতীয় লিঙ্গ। তৃতীয় লিঙ্গ আসলে এক বড় ধারণা। তার মধ্যে সমকামী, রূপান্তরকামী সকলেই নিজেদের পরিচয় খুঁজে পায়। তাদের মতে সামাজিক লিঙ্গ (gender) যেমন নির্মিত জৈব লিঙ্গের (sex) ধারণাও আসলে নির্মিত। যে সমাজে পুরুষ প্রথম লিঙ্গ এবং নারী দ্বিতীয় লিঙ্গ হয়েও নিজেদের অধিকার ক্ষমতা যথার্থভাবে পায় না, সেখানে তৃতীয় লিঙ্গের প্রতি পুরুষ সমাজের ধারণা খুব সহজেই অনুমেয়। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের উপস্থিতি সব যুগে-সময়েই সমাজে ছিল। কিন্তু তাদেরকে সব সময় নিজেদের পরিচয় ভুলে নারী বা পুরুষের পরিচয়ে বাঁচতে হত। পালন করতে হত নারী-পুরুষের নির্দিষ্ট লিঙ্গভূমিকা।

নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের পরবর্তী সময়ে উত্তর-গঠনবাদ, উত্তর-উপনিবেশবাদের মত তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার অর্জনের লড়াইও নারীবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সমাজে 'তৃতীয় লিঙ্গ'র অবস্থান নিয়ে, তাঁদের নিজেদের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার লড়াই নিয়ে নবনীতা দেব সেন সচেতন। তাই তাঁর গল্পে, উপন্যাসে এই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসে। সমকাম প্রায় অচ্ছুৎ এবং নিষিদ্ধ প্রসঙ্গ । সমকামিতার উল্লেখ থাকলেও সমকামীদের নিয়ে সত্যকারের ভাবনা-চিন্তা করে কাজ করেছেন এমন লেখক বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। বাঙালি সমাজে এই ধারণার পরিবর্তনফতে শুরু করে স্বপ্নময় চক্রবর্তী *হলদে গোলাপ* , ঋতুপর্ণ ঘোষের *ফার্স্ট পার্সন* বা মানবী বন্দোপাধ্যাইয়ের বই *আমার অর্জিত নারীত্ব* প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে।

এই সবকিছুর অনেক আগেই একটি পুরুষের লিঙ্গ পরিবর্তনের কাহিনি নিয়ে নবনীতা গল্প লিখছেন 'বাপ রে বাপ' (১৯৯০)। যেখানে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'সোমেশ' অপারেশনের মাধ্যমে তাঁর লিঙ্গ পরিবর্তন করে পূর্ণাঙ্গ নারী হয়ে 'সোমা' নাম নিয়ে ফিরে আসেন তাঁর পরিবারের কাছে। সোমেশ শরীরে পুরুষ হলেও মনে মনে নারী হওয়ার ইচ্ছে তার বহুদিনের। স্ত্রীর ও পরিবারের চাপে, আত্মীয়-বন্ধুদের ভয়ে কোনও দিন সে নিজের এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে পারেনি। যদিও সোমেশ অনেক আগেই জানিয়েছিল তাঁর স্ত্রীকে তাঁর এই পরিচয়ের কথা কিন্তু তাঁর স্ত্রী মেনে নিতে পারেনি সমাজের চাপে। যতবার সে ফ্যারা রুস্তম, মত রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে লেখা বই তুলে দিয়েছেন স্ত্রীর হাতে ততবার যে সেই বইগুলো ফেলে দিয়েছে। তাই এক দিন সবাইকে না জানিয়েই সোমেশ নিজেই সিদ্ধান্ত নেন সোমা হওয়ার। নবনীতা দেব সেন শুধু এই নিয়ে গল্প লিখলেন না তিনি গল্পে দেখালেন সোমেশ সোমা হয়ে আসার পর তাঁর ছেলে-মেয়ে এবং পরিচারিকা বৃন্দও তাকে মেনে নিয়েছে।

নবনীতার গল্পে কিন্তু সোমেশ সোমা হতে পেরেছে। তাঁর পরিবারের প্রতিক্রিয়া খুব সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন নবনীতা দেব সেন। শুধু রূপান্তর কামনা নয়, সমকাম প্রসঙ্গে তাঁর লেখা উপন্যাস 'বামা-বোধিনী'। উপন্যাসেও দুই সমাকামী পুরুষকে নিজেদের সমকামী পরিচয় নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা গেছে।

সমাজের নানান সমস্যা নিয়ে নবনীতা যখন গল্প লেখেন সেই গল্পের বিষয়বস্তুর নির্বাচনই বলে দেয় তাঁর লিঙ্গসচেতন, সংবেদনশীল মনকে। এমনকি যে বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ কথা বলেনা সেই বিষয়গুলিও তাঁর লেখায় প্রাধান্য পায়। তিনি বর্তমান অবস্থার কথা বলে তারপর সেই পরিস্থিতির বিকল্প পরিস্থিতি তৈরি করেন তাঁর গল্পে। গল্পের বিষয় নির্বাচনে যে সাহসিকতা দেখান তাতেই বোঝা যায় সমাজ পরিবর্তনের আশা সমাজে মেয়েদের উন্নতির মূল্যায়ন তিনি করে যাচ্ছেন তাঁর গল্পের মাধ্যমে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় নবনীতা নিজে শুধু এই বিষয়গুলি নিয়ে গল্প লিখছেন তাই নয়, উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় সমাজের নানা সমস্যা নিয়ে লেখা গল্প অনুবাদও করেছে। যে গল্পগুলোর প্রধান বিষয় নারীর করুণ অবস্থা, ক্ষমতাহীনের প্রতি ক্ষমতাবানের আগ্রাসন, বিকৃত যৌনক্ষুধা ইত্যাদি। এই গল্পগুলোর অনুবাদ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার মন্তব্য করেন যে গ্রন্থটিকে অনুবাদ গ্রন্থ না বলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলাই শ্রেয় কারণ এই গ্রন্থ নবনীতা দেব সেনের স্বকীয়তায় আর অনুবাদ গ্রন্থ থাকে না। নবনীতার লেখা গল্পের সঙ্গে এই গল্পগুলো যখন মিলে যায় তখন বোঝা যায় শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় ভারতের অন্যান্য রাজ্যের প্রেক্ষাপটেও এই গল্পগুলো কতটা প্রাসঙ্গিক। আর এই গল্পগুলোর অনুবাদের প্রয়োজনীয়তাই বলে দেয় সমাজের প্রকৃত সত্য তুলে ধরে পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া কতটা প্রয়োজনীয় মনে করেন নবনীতা দেব সেন।

নবনীতা দেব সেনের বেশ কিছু গল্পের প্রকাশকাল পাওয়া যায় না। কিন্তু গল্পগুলো যে গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, তার প্রকাশকাল থেকে গল্পগুলি লেখার সময়কাল নিয়ে একটা ধারণা পাওয়া যায়। এই ধারণার ভিত্তিতে বলা যায় বিশ শতকের শেষ দশকের থেকেই তাঁর লেখায় একটা পরিবর্তন আসে। যা সব থেকে ভালো বোঝা যায় তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থ *রাগ অনুরাগ এবং অন্যান্য গল্প* (২০০৩) গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে। নবনীতা দেব সেন নানা বিষয় নিয়ে গল্প লিখলেও গল্পে নির্মাণের এবং উপস্থাপনের নানান বৈচিত্র্য থাকলেই একুশ শতকে লেখা গল্পগুলি যেন অনেক বেশি উদ্দেশ্যভিত্তিক এবং প্রত্যক্ষ। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়েই তিনি লেখেন এই পর্যায়ে। আগে সমাজের যে সমস্যাগুলো, যে ধারণাগুলো তাঁর গল্পের বিকাশে সাহায্য করত; যে ভাবনা চিন্তা তাঁর গল্পের পটভূমি হত, এখন সেই বিষয়গুলোই হয়ে উঠেছে গল্প। আগে তাঁর লেখায় যে নির্মল হাস্য, কৌতুক পাওয়া যেত, স্বাভাবিক ভাবেই এই গল্পগুলোর ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। আগে গল্পগুলোতে গল্পের ভাগ বেশি ছিল এখন তা হয়ে উঠেছে প্রধানত সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক। সেই কারণে তার লেখা ক্ষুরধার হচ্ছে। নবনীতা দেব সেন এমন বিষয় গুলো নিয়ে শতাব্দীর শুরুতেই গল্প লিখে ফেলছেন যা নিয়ে হয়ত পরে অনেক বৌদ্ধিক স্তরে আলোচনা হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় নবনীতা দেব সেনের সংবেদনশীল মনের ভাবনা-চিন্তা অনেক অগ্রবর্তী, দূরদর্শী ও সময়সচেতন। এভাবেই নবনীতা পরিবর্তিত সমাজের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেন নারীর লিঙ্গনির্মাণ।

তথ্যসূত্র :

১ https://glosbe.com/en/en/SAARC%20Decade%20of%20the%20Girl%20Child

২ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৪*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ১৩৪

৩ মল্লিকা সেনগুপ্ত, *মল্লিকা সেন গুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪৪

৪ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, আগষ্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৯-৯০

৫ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, আগষ্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা ৯১

৬ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৩*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ২৫১

৭ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৪*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ২১৭

৮ অভিজিৎ সেন (সম্পাদক), *রাধারাণী দেবী রচনা সংকলন ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৩৫-১৬৫

৯ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৪*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ১৪০-১৪১

১০ Dilip Kumar Chakraborty, et al.*Navaneeta 79*.karigor,2007.Print.p.79

১১ Nivedita Menon. *Seeing like a Feminist*. Zubaan, 2012. Print .p.204

চতুর্থ অধ্যায়

নবনীতা দেব সেনের কলমে প্রতিবাদী স্বর

উনিশ শতকের থেকে বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হলে তার কয়েক বছর পর থেকেই মেয়েরা লিখতে শুরু করেন। প্রথম দিকে তাঁরা ছদ্মনামে লেখেন আত্মপরিচয় গোপন করার জন্যে। যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা স্বনামেই সাহিত্য রচনা করলে তাঁদের লেখার বিচার করা হয়ে মেয়েদের লেখা পুরুষদের লেখার কতটা কাছকাছি সেই হিসেবে। তাই মেয়েরা চেষ্টা করে যতটা সম্ভব মান্য ভাষায় লিখতে। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রত্যেক ভাষার মতই বাংলা ভাষাও আসলে পুরুষ নির্মিত man made।[১] আর ভাষার মাধ্যমেই পুরুষতন্ত্র নিজের শাসনের নানা নিয়ম শিখিয়ে দেন নারী-পুরুষ সকলকে। তাই ভাষাই হল সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে আমরা শিখি পুরুষতন্ত্রের শেখানো বুলি। কেন্দ্রে পুরুষ ও তাঁর নির্মিত ভাষা এবং পরিধিতে নারী এবং তৃতীর লিঙ্গ, শিশু বা বলা ভালো যা কিছু পুরুষসর্বস্ব নয় তারা এবং তাদের বলতে চাওয়া ভাষা।

তাই বাংলা এবং ইংরাজি যে কোনো সাহিত্যেই প্রথম দিকে যে সব নারীরা সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁরা প্রধানত পুরুষতন্ত্রের ভাষাকে আত্তীকরণ করেই লিখছিলেন। কারণ তাঁদের সামনে কোনো উদাহরণ যেমন ছিল না তেমনই ছিল না এই বিষয় সম্বন্ধে সচেতনতা। ফলে তাঁদের লেখাও নির্ধারিত হচ্ছিল পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারাই। তাঁরা নিজেদের কথা বলতে গিয়েও সম্পূর্ণটা বলতে পারছিলেন না। নারীবাদের তৃতীর তরঙ্গের উত্তর আধুনিক নারীবাদী হেলন সিক্সু, জুলিয়া খ্রিস্টেভা, লুইস ইরিগ্যেরে ভাষা ব্যবহারের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন। সিক্সু বলেন 'এক্রেতুর ফেমিনাইন'[২] এর কথা। যা ভাষার দ্বারা বোঝানো কঠিন। কিন্তু এই সব নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মেয়েদের নিজের ভাষা, স্বর তৈরীর অপর গুরুত্ব দেন।

ক্যারল গিলিগান (Carol Gilligan, 1936) একজন অধ্যাপক, মানোবিদ এবং নারীবাদী তাত্ত্বিক। ১৯৮০ সালে দরদি নৈতিকতার (Care Ethices)[৩] সূচনায় দীর্ঘদিনের সমীক্ষা এবং

নারী-পুরুষের সমাজ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি বলেন সমাজে প্রচলিত স্বর আসলে পিতৃতান্ত্রিক কণ্ঠস্বর (Patriarchal voice)। এবং মেয়েরা এই বিষয়ে সচেতন না হলে তাঁরা আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শেখানো বুলিতেই নিজেদের সাহিত্য রচনা করে ; তখন সেই স্বর হয়ে যায় মিথ্যা মেয়েলি কণ্ঠস্বর। সমাজে মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাই তাঁরা যখন সেই অভিজ্ঞতা থেকে ভাষাকে নিজের মত করে ব্যবহার করেন তখন তৈরি হয় 'ভিন্ন স্বর' বা 'স্বতন্ত্র স্বর' (different voice)। ক্যরল গিলিগ্যান মেয়েদের 'ভিন্ন স্বর' তৈরীর প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। তিনি এই স্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন -

> I say that by voice I mean something like what people mean when they speak of the core of the self. Voice is natural and also cultural. It is composed of the breath and sound, words and rhythm and language.[৪]

মানে সেই স্বর যা সত্তার গভীরতা থেকে নির্গত হবে। কিন্তু এখানে ভাষা আর স্বরের মধ্য একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে । ভাষা হল নিজের মনের ভাব অন্যদের বোঝানোর মাধ্যম অন্যদিকে স্বর তৈরী হয় ভাষার আর মনস্তত্ত্বের দ্বারা। তার সাথে থাকে নিঃশ্বাস, ছন্দ, সুর ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এই স্বর আলাদা হয়ে যায়। এমনকি যখন নারীরা এই স্বর নির্মাণ করতে যান তখন প্রত্যেক নারীর ক্ষেত্রেও এই স্বর আলাদা হয়ে যায়। মল্লিকা সেনগুপ্ত এই প্রসঙ্গে বলেন — "নারীর নিজস্ব ভাষা গড়ে উঠবে পিতৃতন্ত্রের শেখানো অনুষঙ্গকে ভুলে গিয়ে, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বা তাকে অতিক্রম করে।"[৫]

'ভিন্ন স্বর' যখনই বলা হচ্ছে তখনই আর একটা স্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। একটা স্বর আছে যা প্রধান তার থেকে আলাদা অর্থে ভিন্ন স্বর। তাই প্রথমেই বোঝা দরকার সেই মান্য স্বর কী? যা থেকে আলাদা অর্থে নারীর স্বরকে 'ভিন্ন স্বর' বলা হচ্ছে। আসলে এখানে মান্য, আদর্শ এই শব্দগুলো ব্যবহার হচ্ছে পুরুষতন্ত্র এবং তাদের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বরের উৎকর্ষ অর্থে। কিন্তু যখনই সেই স্বরে কেউ কথা বলছেন না তখনই তাকে ভিন্ন বলা হচ্ছে কিছুটা 'ঘাটতি' অর্থে। তাই এই স্বর বা পুরুষতন্ত্রের কথায় বললে 'ঘাটতি' আসলে এক এক নারীর এক এক রকম। তাদের মধ্যে মিলের জায়গা হল তাদের স্বর নির্মাণের প্রয়াস।

মেয়েদের স্বর তাঁদের নিজেদের কথা বলে তাই এক এক জন নারী নিজের মত করে স্বর খুঁজতে গিয়ে নিজেদের জীবনের এক একটি উপাদানের ওপর জোর দেন। কেউ কোনো তত্ত্বের সাহায্য নেন, কেউ নিজের শরীরের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন নিজেদের অভিজ্ঞতা, কেউ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের আদলেই নির্মাণ করেন 'ভিন্ন স্বর'। মল্লিকা সেনগুপ্ত এই স্বর নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলছেন- "কে কিভাবে লিখবে, কে কোন 'মডেল' গ্রহণ করবে জীবনের, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ব্যক্তি নিজেই নেবে , কোন বাধা গত অনুসরণ না করেই।"[৬]

এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে যদি নবনীতা দেব সেনের লেখাকে স্থাপন করা যায় তাহলে দেখা যাবে তাঁর লেখক জীবনের শুরু থেকেই তিনি 'ভিন্ন স্বর' নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কারণ তিনি যে ধরনের গদ্য লিখতেন সেই গদ্য লিখতে প্রয়োজন ছিল স্বকীয়তার। নবনীতা দেব সেন যেমন তাঁর নিজের স্বর বা 'স্বতন্ত্র স্বর' নির্মাণ করতে গিয়ে ব্যক্তি হিসেবে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যবহার করছেন। তাঁর নির্মিত স্বরের বিভিন্ন দিক গুলো হল - সহজ,

সরল ভাষার ব্যবহার, প্রথাকে ভাঙ্গার প্রবণতা, অপেক্ষাকৃত হালকা বিষয়ে যা প্রথাগত ভাবে সাহিত্য পদবাচ্য নয় সেগুলোকে নিয়ে লেখা, ছোটগল্পই হোক বা উপন্যাস, আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতাকে প্রসারিত করা, বৈঠকী মেজাজ, সবাইকে আপন করে নেওয়ার বিরল ক্ষমতা, বাঙালিয়ানা, আত্মোসমালোচনা এবং সব কিছুকে অতিক্রম করে এক কৌতুক প্রবণ মনের সরসতা। তাঁর এই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য গুলোই তাঁর স্বরকে নিয়ন্ত্রিত করে।

কিন্তু যখন কোনো নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শেখানো বুলিকে অমান্য করে, মান্য ভাষার সূত্রকে অবহেলা করে সাহিত্য লিখছেন নিজের মত করে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এবং সর্বোপরি নিজের স্বতন্ত্র স্বরে তখনই সেই নারীর স্বতন্ত্র স্বরের বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁদের লেখার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। আর এখানেই আসে সাহিত্য বিচারের মানদন্ডের কথা। পুরুষশাসিত সাহিত্য জগতের তৈরি 'নিরপেক্ষতা', 'ন্যায়নীতি' এবং 'নৈর্ব্যক্তিকতা'-র মানদন্ডে নবনীতার স্বর বিচার করা হলে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গুলো আসে তা হল- 'তিনি হালকা বিষয় ছাড়া লিখতে জানেন না', 'তিনি মজার গল্পই লেখেন', এবং 'নিজেকে নিয়েই লেখেন' ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর গল্পের নিবিড় পাঠক জানেন এই অভিযোগগুলি সর্বৈব সত্য না। তাই দরদি নৈতিকতার মানদন্ডেই তাঁর ভিন্ন স্বরের নির্মাণকে বোঝা সম্ভব।

নবনীতা দেব সেনের এই স্বর নির্মাণের প্রাথমিক উপাদান হল ভাষা। গবেষণার কাজ ইংরাজিতে করলেও তিনি সাহিত্য রচনা করে থাকেন প্রধানত বাংলায়। তাঁর গদ্যের ভাষা প্রধানত সহজ, সরল, নির্মেদ যা প্রায় সব রকমের ভাব প্রকাশে সক্ষম। তাতে যেমন লেখা যায় মহাকাব্যের চরিত্রদের বীরত্ব তেমনই লেখা যায় নবনীতার নিজের বহুবার বাক্স হারানোর কাহিনিও। হালকা ছলে অনেক গভীর কথাও বুঝিয়ে দিতে পারে তাঁর গদ্যভাষা। নবনীতা দেব সেনের মা রাধারাণী দেবীর লেখা সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন- "সজীব, সহাস্য,

মুখরা এবং মুখর। তেমনিই কলভষা, উচ্ছ্বাস, প্রাণের উদ্বেলতা, বাণীতে নিজের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট।[৭] নবনীতা আসলে মায়ের কাছ থেকে শিখেছেন লঘুস্বরে গভীর কথা বলা কেবল শিল্পেরই শিক্ষা নয়, জীবনের সম্বল। যার সঙ্গে মিশেছে তাঁর নিজস্ব পাণ্ডিত্য। তাঁর গদ্য মুখের ভাষার খুব কাছাকাছি। মানে নবনীতা যে ভাবে ভাবেন এবং কথা বলেন প্রায় সেই ক্রমেই, সেই ধারাতেই তাঁর লেখা এগিয়ে চলে। কাহিনির প্রয়োজনে তিনি অতিক্রম করেন সাহিত্যিক গদ্যের প্রথাগত নিয়মকে; কথ্য এবং লেখ্য ভাষার পার্থক্য মুছে যায় তাই পাঠকের সঙ্গে তাঁর বৈঠকী আড্ডার মেজাজ তৈরি হয়। এবং নবনীতার মূল বক্তব্য পাঠকের মনে অনায়াসে প্রবেশ করে চিন্তার জগৎ আলোড়িত করে।

ভাষাতাত্ত্বিক ইয়েস্পার্সেন (১৯২২) তাঁর গ্রন্থে নারীর ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। তা থেকে অণুপ্রাণিত হয়ে সুকুমার সেন লেখেন ‘বাংলায় নারীর ভাষা (১৯২৭) নামক প্রবন্ধ।[৮] যেখানে তিনি বাংলার কয়েকটি অঞ্চলে নারীদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন নারী ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নতুন শব্দ ব্যবহারের অনীহা, সুভাষণ রীতি, বর্ণনার সূক্ষ্মতা এবং অবশ্যই মার্জিত ভাষার ব্যবহার। বলাবাহুল্য এই বৈশিষ্ট্য গুলো আজ সমান ভাবে প্রযোজ্য না। সমাজে নারীর অভিজ্ঞতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষারও পরিবর্তন হয়েছে, তাই নারী নতুন শব্দ প্রয়োগ করতে চায় না এই কথা আর খাটেনা। নবনীতা দেব সেনের লেখাতেই দেখা যায় তিনি নতুন শব্দ ব্যবহার যেমন করছেন তেমনই নতুন শব্দ তৈরিও করছেন। যেমন- MRI করার অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন ‘MRIয়মাণ’(১৯৯৭) এর থেকে নবনীতার গল্পগুলোর নামকরণের একটা ধরণও দেখা যায়।

নবনীতার স্বতন্ত্র স্বরের অন্যতম উপাদন হল তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা । তাঁর আগে বাংলা শিশু সাহিত্যে হাস্যরস এনেছেন আশাপূর্ণা দেবী। লীলা মজুমদারও এই বিষয়ে অনবদ্য। নবনীতা নিজের স্বীকার করেছেন –

> আমাকে কেউ যখন জিজ্ঞাসা করে আমার প্রিয় লেখিকাদের নাম, আমার প্রথমেই মনে পড়ে আশাপূর্ণা পিসীমার মুখখানা আর আপনাকে। দুজনের লেখার ধরণ যেমন আলাদা, জীবন যাপনেও তেমনি অমিল, মিল শুধু এক জায়গায়। কৌতুকরসের ভাঁড়ারে দুজনেরই প্রচুর রসদ। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত, সুস্থ, স্বতঃস্ফূর্ত রসিকতার ক্ষমতা সবার থাকে না। বাংলা সাহিত্যে আপাতত এর স্বাদ অত্যন্ত অল্প পাই। এই মহার্ঘ শক্তি আপনাদের দুজনেরই ছিল। আপনারা আমাকে মুগ্ধ করতেন। অবাক করতেন।[৯]

বাংলা রসসাহিত্যের ধারায় প্রধানত যে লেখকদের নাম পাওয়া যায় তারা সকলে লিঙ্গ পরিচয়ে পুরুষ। তাই তাঁদের লেখা গল্পে মেয়েদের কথা আসে হাসি তৈরির একটা উপাদান হিসেবে। ত্রৈলোক্যনাথ থেকে পরশুরামের গল্পে মেয়েদের প্রধানত ব্যবহার করা হয়েছে হাসানোর উপাদান হিসেবে। মেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলোকে প্রথমে মেয়েলি হিসেবে দেগে দিয়ে তারপর সেই তথাকথিত ‘মেয়েলিপনা’ গুলোকে মাত্রাতিরিক্ত দেখিয়ে তা দিয়ে হাসি তৈরী করেন তাঁরা। শিব্রাম চক্রবর্তী থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের হাসির নিজস্ব ধরণ আছে। তাঁদের লেখার ধরণ এতই আলাদা যে তাদের লেখা সাহিত্যকে আলোচনার ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা মাপকাঠি থাকতে বাধ্য। বরং সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘চাচাকাহিনী’র সাথে অনেকটা মিল আছে নবনীতার লেখার। এক, আন্তর্জাতিকতায় দুই, বৈঠকী মেজাজে। মুজতবা আলীর লেখাতেও তিনি ব্যঙ্গ-শ্লেষের ব্যবহার করেন আর নির্মল হাস্যর সঙ্গে বৈদগ্ধ্যকে মিশিয়ে দেন। কিন্তু বাংলা

রস সাহিত্যে মেয়েদের উপস্থিতি সার্বিক ভাবেই কম । মানে মেয়ে লেখকদের উপস্থিতি যেমন কম তেমনি পুরুষ এবং মেয়ে দুই ধরণের লেখকদের সৃষ্ট চরিত্র হিসেবে রসিক মেয়েদের উপস্থিতিও কম। কিন্তু বাস্তবে মেয়েদের কথার অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে হাসি। এবং এই হাসি মেয়েদের সহজাত তাহলে রসসাহিত্যে তাদের উপস্থিতি কম কেন? নবনীতা দেব সেন 'হাসতে মোদের মানা'[১০] প্রবন্ধে রস সাহিত্যে মেয়েদের অনুপস্থিতির কারণ গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং দেখাচ্ছেন রসসাহিত্যে মেয়েরা একেবারে অনুপস্থিত তা নয় হাসি বা কৌতুক তৈরীর 'বিষয়' হিসেবে তারা আছে 'বিষয়ী' তারা কখনই হতে পারছেন না। তার কারণ হচ্ছে মেয়েদের মেয়ে হিসেবে বড় হওয়া এবং সমাজের কাঙ্খিত ভূমিকা তাদের পালন করা। তাই তারা এইটা শুনেই বড় হয় যে তাদের জোরে হাসা বারণ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের লেখায় হাসি পাওয়া যায়না একদম একথা ঠিক নয়। নবনীতা দেব সেন সেই সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু একি সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন-

> আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন আমার লেখার স্টাইলের ওপরে কোনো প্রিয় লেখকের প্রভাব আছে কিনা, আমি বলব সোজাসুজি প্রভাব হয়তো নয় কিন্তু গভীর অনুপ্রেরণা আছে। আমার নিজের পরিবারকে নিয়ে লেখা মজার গল্পের মধ্যে আপনার, (লীলা মজুমদার) আর কৌতুকের সঙ্গে পুরাণের পুনঃকথনের মধ্যে পরশুরামের, একজন একনিষ্ঠ পাঠকের ছায়া আমি দেখতে পাই।[১১]

নবনীতা দেব সেনের তাঁর স্বভাবজাত রসবোধ থেকে যে বিষয় নিয়েই লিখুন না কেন সেই লেখায় একটি কৌতুকপ্রবণ মন ক্রিয়াশীল থাকে যে জীবনের ছোট ছোট অসঙ্গতিগুলি লক্ষ্য করে। যা নিয়ে সে নিজে হাসেন আবার অন্যদেরও হাসান। এই সরসতা, কৌতুকপ্রিয়তা এবং জীবনকে দেখার এমন বলিষ্ট ভঙ্গি তিনি পেয়েছিলেন সম্ভবত তাঁর মায়ের থেকে।

রাধারাণী দেবীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি পত্রে তাঁর লেখা সম্বন্ধে বলেছিলেন "তোমার লেখনীর একটি স্বকীয় চেহারা আছে, তার ছবি আঁকা চলে। মনে পড়ছে একটি ঠাট্টার সম্পর্কের মেয়ের , ঠাট্টার জবাব দিতে কখনও তাঁর বাধে না।"[১২] এছাড়াও রাধারাণী দেবীর লেখাকে যে বিশেষণে কবি বিশেষিত করেছিলেন সেগুলি হল- 'সজীব' , 'সহাস্য', 'মুখরা' এবং 'মুখর'। এমনিই মায়ের মাতৃয়ার্কিতে বড় হওয়া নবনীতার রসবোধ যে শাণিত হবে তা সহজেই অনুমেয়। নবনীতা নিজেই তাঁর লেখায় রাধারাণী দেবী মানে অপরাজিতা দেবীর প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। নবনীতা দেব সেনের লেখার ওপর তাঁর গুরুপত্নী এবং বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম লেখক প্রতিভা বসুর প্রভাবও দেখা যায়। এমন পন্ডিত অথচ রসিক মানুষদের সাহচর্যে নবনীতা দেব সেনের রসোবোধ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

নবনীতা দেন সেন তাঁর লেখায় হাসিকে নানা ভাবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু হাসিরও বিভিন্ন ভাগ আছে - Wit, Humour, Comic, Funny, Satire, Lampoon, Nonsensical ইত্যাদি।[১৩] বাংলায় হাসির রচনা নামের মধ্যে হাসির সব ভাগগুলো মিলিয়ে যায় তাই 'কৌতুক', 'ব্যঙ্গ', 'বিদ্রূপ', 'শ্লেষ', 'আবোল-তাবোল' ইত্যাদি সব কিছুকেই বাংলায় হাসি বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। নবনীতা দেব সেনের লেখায় প্রধানত দেখা যায় wit এবং humour। Wit হচ্ছে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি;[১৪] তার মধ্যে সংক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম ভাব আছে অস্পষ্ট কথায় বক্তব্যকে পরিপূর্ণ করে বুদ্ধিকে চমক লাগিয়ে বিস্মিত করে। বুদ্ধির সন্তোষই এই হাসির প্রধান লক্ষ্য । wit এর মধ্যে হিংসা দ্বেষের ভাব একটু ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছা থাকে । কিন্তু humour হল হৃদয় গ্রাহ্য। চতুর কথায় সীমাবদ্ধ না। নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ বিধান করে হাসায়। এর আবেদন হৃদয়ের কাছে। নবনীতা দেব সেনের লেখায় দু রকম হাসিই এমন ভাবে মিশে যায় তাদের আলাদা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে । তাঁর এক এক ধরণের গল্পে হাসির নানা উপাদানকে নিজের মত করে

ব্যবহার করেন। প্রধানত নিজেকে নিয়ে ও মহাকাব্য গুলির চরিত্রদের পুনঃকথনে এই জাতীর হাসি দেখতে পাওয়া যায়।

নবনীতা নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিয়ে যে মজার গল্প গুলো লেখেন তাতে হাসির যে সব উপাদান ব্যবহার করছেন তা প্রধানত সামাজিক জীবন নিয়ে অযোগ্যতা বশত হাসি। যেমন নবনীতার মত অনেক মানুষই প্লেনে করে বিদেশ যান কিন্তু বার বার স্যুটক্যেস হারান নবনীতা। হারিয়ে ফেল জিনিসের তালিকা প্রস্তুত করা যায় নবনীতার লেখা থেকে কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করে করে তিনি সফল হন। কোনো কিছুই তাঁকে আটকাতে পারে না। নিজেই নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন তিনি। যেমন অমর্ত্য সেন নোবেল পেলে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবে নবনীতার ওপর মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে যায় তখন নবনীতা নিজেই সেই দুর্দশার কথা বলে হাসেন এবং হাসান। পান্ডিত্য এবং কৌতুক প্রিয়তাকে একাসনে ভাবা যায় না কিন্তু সমাজের দৃষ্টিতে নবনীতার কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর পান্ডিত্যের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু পরশুরামের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তিনি যেমন রামায়ণের অনুবাদ করেছেন তেমনই আবার রামায়ণের চরিত্রদের নিয়ে মজার গল্পও লিখলেও তাঁর ক্ষেত্রে তেমন হয় না। আসলে পান্ডিত্যের সাথে কৌতুকের, বিরোধ নেই । তবে নবনীতা নিজেই নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেন-

> মহামহোপাধ্যায় পন্ডিতদের মাঝখানে জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ পেশ করতে এলুম এসে কিনা কেবলই চুরি জোচ্চুরি জাল-জালিয়াতির দায়ে ধরা পড়ছি? আমার এই ছিঁচকে টাইপ চেহারাটাই হয়েছে যত পান্ডিত্যের পরিপন্থী। আমার জীবনে আসছিলে বাবা বিদেশ বিভূঁয়ে বক্তৃতা দিতে। যে যতই ডাকুক! হ্যাঁ![১৫]

আসলে এই ব্যক্তব্যের মধ্যে নিজের আক্ষেপের থাকেও বেশি আছে সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ। যেখানে স্মার্ট দেখতে লোকদের বিদেশ যাওয়ার যোগ্য মনে করা হয়। আবার একই লেখায় সুটক্যেস হারিয়ে নবনীতা বেল্টের অভাব পূরণ করেন নাইলনের লাকলাইন দড়ি দিয়ে। wit ও humour মিশে পাঠক হাসেন এবং শেখেন প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করার পদ্ধতি। নবনীতার লেখার একটা বিশেষ প্রবণতা হল তাঁর ভাষায় আবেগ এবং অভিব্যক্তি খুব ভালো করে ফুটিয়ে তোলেন নবনীতা। আগের উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় নবনীতা বাক্যটা শেষ করেন 'যে যতই ডাকুক! হ্যাঁ!' বলে। 'যে যতই ডাকুক' বললেই নবনীতার মনোভাব বুঝে নেওয়া যেত কিন্তু নবনীতা যখন বললেন 'হ্যাঁ!' কথাটি তখনই তা হবহু মুখের ভাষার মত শোনালো এবং পাঠক তা শুনে কিছুটা হেসেও ফেললেন। এই ছোট ছোট অভিব্যক্তি নবনীতা তাঁর গদ্যে প্রয়োগ করেন এবং পাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় মুখের ভাষাতেও গদ্য লেখা যায়। ভাষা শুধু ভাব প্রকাশের নয়। পাঠকের সামনে উপস্থিত না থেকেও শুধুমাত্র ভাষার মধ্যে দিয়ে নবনীতার আবেগ, অভিব্যক্তি পৌঁছে যায় পাঠকের কাছে। নবনীতার ভাষা তখন হয়ে ওঠে একেবারেই নবনীতার 'স্বতন্ত্র স্বর'।

নবনীতা দেব সেন মহাকাব্যের নারী চরিত্রদের নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের শুরুতে বলেন নারী চরিত্রদের দুঃখের মূল্যেই মহাকাব্যের নায়কদের বীরোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয়। তাই নবনীতার গল্পে সেই নারী চরিত্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহাকাব্যকে দেখান; কখনও মূল ঘটনাকে অপরিবর্তিত রেখে কখনও বা বিকল্প সম্ভবনার রঙ চড়িয়ে। যখনই নারী চরিত্রদের যুক্তিতে এই মহাকাব্যিক ক্ষণিক মুহূর্তগুলিকে পুনর্নির্মাণ করেন তখনই প্রকাশিত হয় পুরুষ চরিত্রগুলোর এমন কিছু দিক যা নিয়ে মহাকাব্য নীরব। নৃসিংপ্রসাদ ভাদুড়ি *দেবতার মানবয়ান* বইতে দেখান রামচন্দ্রের বোকামি এবং কলঙ্ক নিয়ে ব্যাস থেকে ক্ষেমেন্দ্র,

কৃত্তিবাস থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সবাই নিজের মত করে রামের সমালোচনা করেন। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী নিজেও রামের বোকামি প্রসঙ্গে বলেন -

> একবার লঙ্কাকান্ড করে সীতা উদ্ধার, তারপর কতগুলো বানরের সামনে তাঁর অগ্নিপরীক্ষা, পুনশ্চ লোকের মুখে ঝাল খেয়ে আবার তাকে বাল্মীকির তপোবনে নির্বাসন দেওয়া –বোকামির এই মালোপমা রামচন্দ্রের জীবন ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে?[১৬]

'অমরত্বের ফাঁদে' গল্পে দেখা যায় রাক্ষসীরা রামকে তীব্র ব্যঙ্গ করছেন। বা লক্ষ্মণ শূর্পনখাকে বলছেন "টেটিয়া স্ত্রীলোক"[১৪]। পৌরানিক চরিত্রগুলোর মুখে এমন কথ্য ভাষায় কথা শুনে আপাত ভাবে হাসি পেলেও এর মধ্যে দিয়ে একজন অনার্য স্বাধীন নারীর প্রতি একজন আর্য, অমার্জিত পুরুষের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। বাক্যার্থ কে ছাপিয়ে যায় ব্যঙ্গার্থ।

নবনীতা মহাকাব্যের নারী চরিত্রদের পুনঃনির্মাণ করতে গিয়ে এমন অনেক আধুনিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যা সেই সব চরিত্রের মুখে কল্পনাই করা যায় না। 'অথ গঙ্গা সত্যবতী কথা : সতীন সংবাদ' সত্যবতীর মুখে শোনা যায় 'সিরিয়্যালি মোনোগ্যামাস', 'পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট', 'ইন্সট্যান্ট গর্ভ' ইত্যাদি প্রসঙ্গ।[১৫] যে কথা মহাকাব্যিক চরিত্ররা বলতে পারেনি তা নবনীতা দেব সেনের গল্পে তারা বলতে পারেন। নবনীতা পান্ডবদের মাতৃ ভক্তির তুলনা করেন বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির সঙ্গে। রামের বর্ণনা দেওয়ার সময় যে অতিরঞ্জন করেন তা আসলে আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন কাব্যে নারীর সৌন্দর্য বর্ণনার প্রথাকে। তবে এই ভাবে বর্ণনার মাধ্যমে আসলে রামকে হাস্যস্পদে পরিণত করা হয় তাঁর গল্পে। 'রাজকুমারী কামাবল্লী' গল্পে শূর্পণখা রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন 'মহীরুহের মত সতেজ', 'বসন্ত ঋতুর মত উজ্জ্বল মুখশ্রী', 'বজ্রের মত শক্তিমান পুণ্য দেহের অধিকারী শ্রীরামচন্দ্র'। বর্ণনার এই

আতিশয্যর পর যখন রামাচন্দ্রের আসল রূপ পাঠকের সামনে আসে তখন পাঠক হাসতে বাধ্য হন।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দ্বিচারিতা অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে থাকা নারীদের প্রাত্যহিক জীবনে সম্মুখীন হওয়া নানা ক্রূর অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন গল্প লেখেন নবনীতা তখন সেই বিষয়ের প্রয়োজনেই নির্মল কৌতুকের পরিবর্তে দেখা যায় শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। নির্মল হাস্যে যেমন লীলা মজুমদারের প্রভাব আছে তাঁর ওপর তেমনই আশাপূর্ণা দেবীর ব্যঙ্গনিপুণা নারী চরিত্রদের প্রভাব আছে নবনীতার অপর। 'শিশুকন্যাদশক' গল্পে নবনীতা দেখান-

> ডাক্তারের মুখ কালো হইয়া গেল তিন দিন পরেও যখন বাড়ির লোক কেহই আসে নাই , খোঁজ ও করে নাই মা তখন উন্মাদ হইয়া কন্যার গলায় ডেটলের শিশি উপুর করিয়া দিয়াছে।অতি কষ্ঠে পুলিশ ঢাকিতে হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে শিশুকন্যার মৃত্যসংবাদ পৌঁছিবা মাত্রেই স্বামী, শ্বশুর আসিয়া সানন্দে প্রসূতিকে ঘরে লইয়া গিয়াছে।[১৬]

সেই মেয়েটির স্বামী আর শ্বশুরের আনন্দের কারণ কন্যা সন্তানের মৃত্যু। রক্তের টান থাকলেও তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় শিশুটির লিঙ্গ পরিচয়। তাই কন্যা শিশু মারা গেলে তারা খুশি হয়। এই পৌশাচিক আনন্দ দেখিয়ে নবনীতা আসলে শ্লেষের চাবুকে আঘাত করেন মেয়েটির স্বামী শ্বশুরের মত মানসিকতাসম্পন্ন হাজার হাজার মানুষকে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়াকে। 'বামন-মুচি-রাজা' গল্পে দেখা যায় এমন এক জন পুরুষকে যে নিজেই স্বীকার করেন -

একটা গোপন প্রেম না হলে আমি বোধহয় বাঁচতে পারি না তমসা,... শরীর শরীর তোমার মন নেই অভিষেক? আছে! আর সেইটেই তো মুশকিল তমসা না থাকলে তো মিটেই যেত।[১৭]

তমসার প্রশ্ন করার আগে অভিষেক নিজে বলে দিচ্ছে বা কিছুটা দাবী করেছে তাঁর মন আছে । আর মন আছে বলেই সে এক সঙ্গে তিন জন নারীকে ঠকিয়ে দুঃখ পাচ্ছে! পুরুষের বহুগামিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই অভিষেক। গল্পে তাঁর জবানিতেই নবনীতা হাজির করেছেন তাঁর বহুগামী মনের নকশা। নবনীতা বিদ্রূপের ভঙ্গিতেই দেখান অভিষেকের মত মানুষদের মন আছে বলেই সে বহুনারীর সঙ্গে সম্পর্কে যুক্ত হয়েও আক্ষেপ করছে। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের "পুতুল নাচের ইতিকথা" উপন্যাসের শশীর কুসুমকে বলা উক্তির পুনর্নির্মাণ করছেন নবনীতা এবং কথকের মুখেই যেন বৃথা চেষ্ঠা করছেন তাঁর মনের অস্তিত্ব প্রমাণের। উত্তম পুরুষ কথনে চিঠির ভঙ্গিতে অভিষেক নামের পুরুষটি নিজেই নিজেকে হাস্যস্পদ করে তুলছে।

নিজেকে নিয়ে রসিকতা করা নবনীতা দেব সেনের বিরল প্রতিভা। যখন wit আর humour একত্রিত হইয় তখনই হৃদয় ও বুদ্ধিকে একসঙ্গে পরিতৃপ্ত করে বিশুদ্ধ হাস্যরস উদ্রেক করে। নবনীতার হাসি প্রধানত wit আর humour এই দুই একটি মিশেল। কখনও এর ভাগ বেশি তো কখন এর ভাগ বেশি। নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে নিয়ে লেখা গল্পগুলোতে যেমন দেখি কীভাবে প্রসারিত করে দেন নিজের ক্ষমতার সীমা। নিজের তৈরি গন্ডি নিজেই মুছে এগিয়ে চলেন। আর এই খেলায় জয়-পরাজয় লেগেই থাকে তাকে নিয়ে গল্প লেখেন নবনীতা দেব সেন। নিজের ভুল গুলোতে নিজেই হাসেন এবং অন্যকেও হাসান। আসলে এর থেকে বোঝা যায় যে কলমে অন্যের, সমাজের সমালোচনা হয় সেই কলমে নিজের

সমালোচনাও করা উচিত। পুরুষতন্ত্রের একটি প্রধান সমস্যা হল সে নিজেকে নিয়ে সমালোচনা করার প্রয়োজন মনে করে না কারণ ক্ষমতা তার হাতে। কিন্তু নবনীতা যখন লেখেন তখন লেখক হিসেবে সব ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সেই মুহূর্তে তিনি সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন নিজের ভুল গুলো গোপন করার বদলে আরো সূক্ষ্ম, আরো সরস ভাবে নিজের এবং অন্যকে নিয়ে হাসানোর জন্যে । আসলে নবনীতা দেব সেন গঠনমূলক সমালোচনায় বিশ্বাসী।

বাঙালিয়ানা নবনীতা দেব সেনের এবং তাঁর গদ্যের একটা বৈশিষ্ট্য। সহজ-সরল-নির্মেদ বাংলায় লিখে তিনি আসলে বাংলা ভুলতে চাওয়া বাঙালিকে তার শিকড়ের সন্ধান দেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাঁর লেখা বাংলায় হিন্দি থেকে ইংরাজি শব্দ কখনও বা হিন্দি এবং ইংরাজি বাংলার সঙ্গে মিশে অদ্ভুত সব শব্দ তৈরী হয় । আসলে বাঙালির অন্য ভাষার প্রতি মুখাপেক্ষিতাকে নবনীতা ব্যবহার করেন দুই ভাবে। প্রথমত, হাসির উপাদান হিসেবে এবং দ্বিতীয়ত, বাঙালির নিজ ভাষা এবং সংস্কৃতিকে ভুলে যাওয়ার প্রতি ব্যঙ্গ হিসেবে। আর আজকালকার বাঙালি যে ভাবে বাংলা বলে সেই ভাবেই কিছু চরিত্রের মুখে সংলাপ বলিয়ে সমাজ বাস্তবতার একটা দিক তুলে ধরেন নবনীতা। সাহিত্যিক বাংলা, কথ্য বাংলা, গ্রাম্য টান যুক্ত বাংলা, কখনও বা হিন্দি কখনও বা ইংরাজী মিলেয়ে তার গদ্য ভাষা নির্মিত হয়। কখনও বাংলা ও হিন্দি মিলিয়ে সংলাপ লেখেন, ফলে গল্পগুলো বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায় এবং কখন তাকে হাসির উপাদান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

নবনীতা দেব সেন নিজের জীবনকে দেখার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সাহিত্য রচনা করে নিজের প্রতিবাদ পৌঁছে দিতে চান পাঠকদের কাছে। নবনীতার স্বতন্ত্র স্বর তাঁর কলমকে আরো শক্তিশালী করে। সেই স্বরে যখন পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন তখন তাঁর প্রতিবাদ ভাষাকে অতিক্রম করে পৌঁছে যায় পাঠকের মনে। নিজের কৌতুক প্রবণতা, সরসতা

দিয়েই পিতৃতন্ত্রের সমালোচনা করেন। তাঁর স্বরই হয়ে ওঠে তাঁর অস্ত্র। মেয়েদের নিজেদের জীবনকে অন্যভাবে দেখার প্রেরণা দেন। তিনি তথাকথিত 'মেয়েলি বৈশিষ্ট্য' হাসিকেই ব্যবহার করেন সমালোচনার জন্যে। কিন্তু সেই হাসিতে বা শ্লেষে কখনই ব্যক্তিগত আক্রমণ, অযথা বিদ্বেষ থাকে না। তাঁর লেখায় থাকে একটি পরিমিতি বোধ তাই সে জানেন কোথায় থামতে হয়। তাই নবনীতা দেব সেন প্রথমে নিজের স্বর নির্মাণ করেন তার পর সেই স্বরে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্যের প্রতিবাদ করেন। এভাবেই নবনীতার কলমে তাঁর 'স্বতন্ত্র স্বর' প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ।

তথ্যসূত্র

১ Toril Moi, *Sexual/textual Politics*. Routledge, 2002. Print p.156

২ চিরঞ্জীব সুর (সংকলক), *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা*, আলোচনা চক্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা ২২১

৩ নন্দিতা বাগচী, চ্যাটার্জী সিনহা অতসী (সম্পাদিত), *দার্শনিক তত্ত্বায়নে নারীবাদ*, অক্ষর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৮২৪ এপ্রিল ২০১৭ পৃষ্ঠা ১৩০-১৫২

৪ Carol Gilligan, 'Letter to Readers, 1993', in *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1992, p.xvi

৫ মল্লিকা সেনগুপ্ত, *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা ১৩৬

৬ তদেব পৃষ্ঠা ১৩৮

৭ *কোরক*, সাহিত্য পত্রিকা, লেখিকাদের লেখালিখি, বইমেলা সংখ্যা ১৪২৩ পৃষ্ঠা ১৭৫

৮ মৃণাল নাথ, *ভাষা ও সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ৯৬

৯ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন রচনাবলি ১ম খন্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,পৃষ্ঠা ৪৪২

১০ নবনীতা দেব সেন, *শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর*, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৭

১১ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন রচনাবলি ১ম খন্ড*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,পৃষ্ঠা ৪৪২

১২ *কোরক*, সাহিত্য পত্রিকা, লেখিকাদের লেখালিখি, বইমেলা সংখ্যা ১৪২৩,পৃষ্ঠা ১৭৬

১৩ চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, *খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস*, সম্পদনা বারিদ বরণ ঘোষ, কারিগর, কলকাতা, মে ২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭

১৪ অজিত কুমার ঘোষ, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ১৬

১৫ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪১

১৬ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ*, আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ২০১৮ পৃষ্ঠা ১৫০

১৭ নবনীতা দেব সেন, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৩*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ৯৭

উপসংহার

নবনীতা দেব সেন তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজেকে। শুধু ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই নয় বিভিন্ন সংরূপে তাঁর লেখা গুলো পড়ে পাওয়া যাবে এক অখন্ড নবনীতা দেব সেনকে । তিনি নিজের জীবনপথে চলার নানা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বিলিয়ে দিতে থাকেন পাঠকদের মধ্যে। তাঁর লেখা পড়ে পাঠকও তাঁর যাপনের অংশীদার হন। এই সব লেখার একটা বড় অংশ নিয়ে থাকে নারীর নির্মাণ। তবে তিনি নারীর কথা বলতে গিয়ে পুরুষশাসিত সমাজের সমালোচনাতেই আবদ্ধ থাকেন না, তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন মেয়েদের সংগ্রামের কাহিনিকে। কারণ বহুকাল ধরে মূলধারার সাহিত্যে মেয়েদের কথা উপস্থাপিত হয়েছে প্রধানত পুরুষ লেখকদের দ্বারা। কিন্তু একজন নারী হয়ে নিজের শরীর মন দিয়ে যে অভিজ্ঞতা মেয়েরা অর্জন করে তা কখনই একজন পুরুষের পক্ষে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব না। তাই মেয়েদের জীবন সংগ্রামের কাহিনি মেয়েরা যখন বলেন তখন তা আলাদা হয়ে যায় পুরুষদের বলা থেকে। আর এই জন্যেই নবনীতা দেব সেন নিজের কথা, আরো মেয়েদের কথা সহমর্মিতার সঙ্গে তাঁর লেখায় তুলে ধরেন ।

নবনীতা দেব সেন নিজেকে নিয়ে কৌতুকের বাতাবরণে গল্প লেখেন। নিজেকে নিয়ে হাস্য পরিহাসের ছলে অনেক কঠিন কথা বলে দেন। তাই গল্পগুলো আমাদের শুধু হাসায় না তার পরিবর্তে ভাবায়ও। আপাতভাবে নিজের গল্প হলেও সেই সময়ে দাঁড়িয়ে যে কাজগুলো তিনি করছেন তা খুব কম নারীই করতে পেরেছেন। একক মা হিসেবে যে ভাবে তিনি তাঁর সন্তানদের মানুষ করেছেন, ব্যক্তিজীবন এবং সাহিত্য জীবনের মধ্যেকার ভারসাম্য যেভাবে

বজায় রেখেছেন তা শিক্ষণীয়। এই গল্পগুলো তাই প্রেরণা হয়ে থেকে যায় আরো মেয়েদের কাছে। এই গল্পগুলোর মধ্যে যে লিঙ্গসচেতনতা থাকে তা সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে আলাদা করে দেয়। তাঁর আত্মসমালোচনা নিজেকে নিয়ে হাসার ক্ষমতা, পাঠকদের নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে। নিজের কথা বলতে গিয়ে আসে তাঁর মা রাধারাণী দেবীর কথাও। যিনি তাঁর সময়ের এক জন বলিষ্ট সাহিত্যিক। ঠিক একই ভাবে অনেক চেনা-অচেনা নারীর জীবন সংগ্রামের কাহিনি তুলে ধরেন তাঁর লেখায়। নবনীতা দেব সেন আত্মজৈবনিক ছোটগল্পগুলোর মধ্যে দিয়ে সাহিত্যিক পরিসরে নিজেকে ক্রমাগত নির্মাণ করেন। এই নির্মাণ কখনও থেমে থাকে না।

মহাকাব্যের নারী চরিত্রগুলো যুগ যুগ ধরে পুনর্নির্মিত হয়ে আসছে কিন্তু পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন কোনো দিনও শেষ হয় না। কারণ যে পুনর্নির্মাণ করেন তাঁর স্থান-কাল-লিঙ্গ-শিক্ষা এবং বিশ্বাসের ধরণ অনুযায়ী বদলে যায় নির্মিত নারীদের অবয়ব। নতুন চিন্তা, মূল্যবোধ দিয়ে মহাকাব্যগুলোকে পড়ার মাধ্যমে বিকল্প সম্ভবনার অনুসন্ধান সম্ভব হয়। প্রত্যেক লেখক নিজেদের মত করে বিকল্প নির্মাণ করেন কিন্তু নবনীতা এই কাজ করেন শুধু গল্প বা উপন্যাস লিখে না, তিনি সাহিত্যের ইতিহাসেও মেয়েদের উপস্থাপনের রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন। বিকল্প পাঠের সম্ভবনার কথা বলে নবনীতা দেব সেন মহাকাব্যের নারীদের মুখে সেই সব যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন করান যে বিষয় গুলো নিয়ে মহাকাব্য নীরব।

নবনীতা দেব সেন সমান ভাবে সমসাময়িক এবং দূরদর্শী। বিশ শতকের শেষে এসেও যে সমাজে নারীর অবস্থা খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি তাই দেখা যায় তাঁর গল্প গুলোতে। রোজকার জীবনের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে গল্প লিখলেও সেই গল্পগুলো উপনীত হয় জীবনের

গভীর সত্যে, অনেক ক্রূর বাস্তবে। নবনীতা আমাদের দেখান রোজকার জীবনে আমরা না বুঝেই কীভাবে প্রতিনিয়ত লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণ করে চলেছি। মানুষের ভাবনাকে প্রভাবিত করার যে ক্ষমতা আছে তাঁর লেখনীর, তাঁকে তিনি ব্যবহার করেন লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ গড়ার মূলধন হিসেবে। তাই সমাজে প্রচলিত নারীর লিঙ্গ নির্মাণ প্রক্রিয়াকে তিনি প্রতি মুহূর্তে প্রশ্ন করেন।

বাকি তিনটি অধ্যায়ে বিভিন্ন সময়ে এবং সমাজে থাকা নারীদের নির্মাণ করলেও চতুর্থ অধ্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় নারীর স্বর নির্মাণের ওপর। নবনীতা দেব সেনও মেয়েদের লেখার ভাষা, স্বর, ভঙ্গির উপর গুরুত্ব দেন। কারণ তিনি মনে করেন যে ভাষা দ্বারা পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধ সংক্রামিত হয় মেয়েদের মধ্যে সেই ভাষার দ্বারা কখনই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক নারীর প্রয়োজন নিজের কথা বলার জন্যে নিজের স্বর নির্মাণের। যে স্বর নির্মিত হবে ভাষার দ্বারা, ভঙ্গির দ্বারা এবং যে লিখছেন সেই নারীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা। নবনীতা দেব সেন তাঁর নিজের লেখা দ্বারা তা প্রমাণ করেন। কৌতুকপ্রবণ মন, হাস্যপ্রিয়তা তাঁর লেখায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। নবনীতা দেব সেন নিজের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত স্বতন্ত্র স্বরকে ব্যবহার করেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে।

নবনীতা দেব সেনের গল্পগুলো শুধুমাত্র নারীকেন্দ্রিক নয়, নারীবাদের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় তাঁর গল্পে। নারীবাদ, মানবীবিদ্যাচর্চা, নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা যেমন সরাসরি আছে তাঁর গল্পে ঠিক সেভাবেই লিঙ্গবৈষম্য, নারীনির্যাতন, কন্যাভ্রূণ হত্যা, শিশুকন্যাদের প্রতি ঔদাসীন্য, মেয়েদের স্বাবলম্বী হতে না দেওয়া, বিবাহ সংক্রান্ত আরোপিত বিধি নিষেধ, স্বামী-স্ত্রী

সম্পর্কের মধ্যে ক্ষমতাবান পুরুষের আগ্রাসন, ধর্ষণ এমনকি তৃতীর লিঙ্গের মানুষের সংগ্রামের কাহিনি অর্থাৎ যে যে প্রসঙ্গ গুলো নিয়ে নারীবাদ কথা বলে নবনীতা দেব সেনের লেখায় সেই প্রসঙ্গ গুলো ঘুরে ফিরে আসে। তবে নারীবাদকে যেমন কোনো একটি সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ করা যায় না তেমনই নবনীতা দেব সেনকেও নারীবাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট মতে আটকানো সম্ভব নয়। তাঁর লেখায় নারী অর্জন করে তাঁর আত্মপরিচয় এবং বিকশিত হয় নারীর অন্তর্নিহিত বৌদ্ধিক শক্তি। গল্পে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানে থাকা নারীরা তাদের নিজস্ব প্রতিবন্ধকতা, পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে ক্রমগাত চলা সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে হাজির হয়। নবনীতা দেব সেন তাঁদের আলাদা আলাদা অবস্থান গুলোকে বোঝার চেষ্টা করেন । কারণ তিনি জানেন নারী বলে কোনো একটা সংজ্ঞায় সবাইকে মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই নিজেদের অবস্থানে থেকেই নিজের শর্তে বাঁচতে শেখান নবনীতা দেব সেন। মানুষের চিন্তার জগতে সামান্য হলেও পরিবর্তন আনার যে ক্ষমতা সাহিত্যিক মাত্রেই আছে নবনীতা তাকে ব্যবহার করেন সমাজে লিঙ্গসচেতনতা তৈরীর জন্যে। এক এক জন সাহিত্যিক এক এক ভাবে এই সচেতনতা তৈরী করেন। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য করে তাঁদের প্রজ্ঞা, সমাজকে দেখার আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। নবনীতা দেব সেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি তাঁর প্রতিবাদ বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন ভাবে করলেও বেশিরভাগ গল্পেই এই দ্রোহ প্রকাশ করেন আত্মশক্তিতে বলীয়ান, আত্মবিশ্বাসী নারী চরিত্রদের নির্মাণের মাধ্যমে।

এই অভিসন্দর্ভে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নবনীতা দেব সেনের গল্পগুলোকে পড়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয় এবং আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর লেখা ছোটোগল্প গুলো এতটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সেই ছোটগল্পগুলোকে নিয়ে আলোচনার অনেক সম্ভবনা থেকে যায়। ছোটগল্পগুলির

আখ্যানতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বোঝা যেতে পারে তাঁর গল্প নির্মাণের শিল্পকে। বাংলা রসসাহিত্যের ধারায় নবনীতা দেব সেনের অবদান ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুজন ব্যতিক্রমী নারী হিসেবে রাধারাণী দেবী এবং নবনীতা দেব সেনের জীবনী লেখার ক্ষেত্রেও এই গল্পগুলোর মূল্য অপরিসীম। আশা করা যেতে পারে ভবিষ্যতে গবেষণায় এই দিকগুলি উন্মোচিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

- দেব সেন, নবনীতা, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৮
- দেব সেন, নবনীতা, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, আগষ্ট ২০১৭
- দেব সেন, নবনীতা, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৩*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১
- দেব সেন, নবনীতা, *নবনীতা দেব সেন গল্প সমগ্র ৪*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

- আচার্য, অরূপ (সম্পাদক), *একান্তরে নবনীতা*, একান্তরে প্রকাশন, কলকাতা
- আচার্য, অরূপ (সম্পাদক), *কবি অষ্টাদশী*, একান্তর প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬
- গুপ্ত, সুদর্শনা (সম্পাদক), *বিশ্বায়ন ও ভারতীয় নারী*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৬
- ঘোষ, অজিত কুমার, *বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা*, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৬৭
- ঘোষ, গৈরিকা, *শিশুকন্যা : এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস, গড়িয়া, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০১৬
- ঘোষাল, শুক্লা (সংকলক ও সম্পাদক), *বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান*, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৫

- চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদক), *নারী পৃথিবী : বহুস্বর*, উর্বী প্রকাশন, নভেম্বর ২০১১
- চট্টোপাধ্যায়, জোৎস্না, *পূর্ব ভারতের রামায়ণ কথা*, গাংচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১১
- চট্টোপাধ্যায়, ডঃ হীরেন, *সাহিত্য-প্রকরণ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পঁচিশে বৈশাখ ১৪০২ (১৯৯৫)
- চৌধুরী, শম্পা (সম্পাদক), *ছোটগল্পের অন্তর্মহল*, রত্নাবলী, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *প্রাচীন সাহিত্য*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, শ্রাবন ১৪২২ (২০১৫)
- দত্ত, অজিত, *বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৬০
- দত্তগুপ্ত, শর্মিষ্ঠা, এবং বাগচী, যশোধরা (সম্পা), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা*, থীমা, কলকাতা, ২০১৪
- দাস, অপু, *বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ : নারীবাদী পাঠ*, বাণীশিল্প, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৬
- দাস, শকুন্তলা, *নারী প্রগতির সেকাল ও একাল*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
- দেব সেন, নবনীতা, *উপমহাদেশের গল্প*, লালমাটি, কলকাতা, বইমেলা ২০১৩
- দেব সেন, নবনীতা, *চন্দ্র-মল্লিকা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২২, কলকাতা
- দেব সেন, নবনীতা, *দশটি উপন্যাস*, আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১০
- দেব সেন, নবনীতা, *ছোটদের গল্পসমগ্র দ্বিতীয় সম্ভার*, লালমাটি, কলকাতা, ২০১০
- দেব সেন, নবনীতা, *নব-নীতা*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৩ (১৯৯৬)
- দেব সেন, নবনীতা, *নবনীতা দেব সেন রচনাবলি*, ১ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
- দেব সেন, নবনীতা, *ভ্রমণ সমগ্র ১*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৮
- দেব সেন, নবনীতা, *ভ্রমণ সমগ্র ২*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অক্টোবর ২০১৭
- দেব সেন, নবনীতা, *শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর*, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৫
- নাথ, মৃণাল, *ভাষা ও সমাজ*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৯

- বসু, বাণী, *অষ্টম গর্ভ*, আনন্দ, কলকাতা প্রথম সংস্করণ ২০০০, নবম মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১৬
- বসু, বুদ্ধদেব, *মহাভারতের কথা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৯
- বসু, রাজশেখর, *পরশুরাম গ্রন্থাবলী প্রথম খন্ড*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৯৪ (১৮৯৬)
- বসু, রাজশেখর, *বাল্মীকি রামায়ণ সারানুবাদ*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪১৮(২০১১)
- বসু, রাজশ্রী, *নারীবাদ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ আগষ্ট ২০১৪
- বন্দোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র, *খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস*, সম্পদনা বারিদ বরণ ঘোষ, কারিগর, কলকাতা, মে ২০১৮
- বন্দোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- জুলাই ১৯৮৮/এ, দ্বিতীয় সংস্করণ পঞ্চম মুদ্রণ- জুন ২০১২/ই
- বন্দোপাধ্যায়, সুরেশ চন্দ্র (সম্পাদক) *মনুসংহিতা*, আনন্দ, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ মার্চ ২০১৭
- বাগচী নন্দিতা, চ্যাটার্জী সিনহা অতসী (সম্পাদক), *দার্শনিক তত্ত্বায়নে নারীবাদ*, অক্ষর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৮২৪ এপ্রিল ২০১৭
- বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র (সংকলক), *সংসদ বাংলা অভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, জুলাই ২০১৬
- ভট্টাচার্য, সুতপা, *মেয়েলি সংলাপ* , প্যাপিরাস প্রকাশনী, কলকাতা , প্রথম প্রকাশ ২০০৫
- ভাসীন, কমলা, *পিতৃতন্ত্র কাকে বলে?*, স্ত্রী প্রকাশন, কলকাতা
- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ*, আনন্দ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ২০১৮
- ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, *মহাভারতের অষ্টাদশী*, আনন্দ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৬
- ভৌমিক, তাপস (সম্পাদক) *রামায়ণ চর্চা ভারতে বহির্ভারতে*, কোরক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০

- মাঝি, মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), *বাংলা সাহিত্যে মহিলা কথাকার*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০১২
- মুখোপাধ্যায়, সোমা (সম্পাদক), *লীলা মজুমদার রচনাসমগ্র প্রথম খন্ড*, লালমাটি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পাদক), *রামায়ন কৃত্তিবাস বিরচিত* ,সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, নবম মুদ্রণ আগস্ট ২০১৮
- মৈত্র, শেফালী, *উজানি মেয়ে : সিমন দ্য ব্যুভোয়ার জীবন ও দর্শন*, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, ২০১৩
- মৈত্র, শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ : দার্শনিক প্রেক্ষিতের নানা মাত্রা*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ২০১৫
- রায়, আলোক, *বিশ শতক*, প্রমা, কলকাতা, বইমেলা জানুয়ারি ২০১০
- সরকার, সুধীর চন্দ্র, *পৌরাণিক অভিধান*, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, ১৪১০ (২০১৩)
- সিংহ, কবিতা, *কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ১৯৮৭
- সেন, অভিজিৎ (সম্পাদক), *রাধারাণী দেবী রচনা সংকলন ১*, দে'জ পাবলিশিং,কলকাতা,নভেম্বর ১৯৯৯
- সেন, দীনেশ চন্দ্র, *রামায়ণী কথা*, তুলসী প্রকাশন, কলকাতা, ১৩১০ (১৯০৩)
- সেনগুপ্ত, মল্লিকা, *মল্লিকা সেন গুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জনুয়ারি ২০১৮
- সেনগুপ্ত, মল্লিকা, *সীতায়ন*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ জুন ২০১৮
- সুর, চিরঞ্জীব (সংকলক), *প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য সমালোচনা*, আলোচনা চক্র, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৬
- হোসেন, সেলিনা, *নারীবিশ্ব*, বরেন্দু মন্ডল (সম্পাদক), অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা ,প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৯

পত্র-পত্রিকা

- আচার্য, অনিল (সম্পাদক), *একান্তর* , সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক, ক্রোড়পত্র, ১২ বর্ষ, চতুর্দশ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০১
- ইসলাম মন্ডল, নাজিবুল (সম্পাদক),*সমকালের জিয়নকাঠি,* মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, জানুয়ারি–জুন ২০১৫
- *কোরক,* সাহিত্য পত্রিকা, মহাভারত চর্চা, শারদীয় ২০১৪
- *কোরক,* সাহিত্য পত্রিকা, লেখিকাদের লেখালিখি, বইমেলা সংখ্যা ১৪২৩
- ঘোষ, পূর্বাণী (সম্পাদক), *পুরবৈয়া,* নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই ২০০১
- *জাগরী,* তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১০
- দাশগুপ্ত, বাসব (সম্পাদক), *নীললোহিত,* একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ২০১৫
- নায়েক, আনন্দরূপ (সম্পাদক), *নকশিকাঁথা,* স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নারী-কবিতা, চতুর্থ-পঞ্চম যুগ্ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৫
- *বনানী,* ছবি কবি ও কথা সংখ্যা, ত্রৈমাসিক সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪
- বিশ্বাস, মৌলিনাথ (সম্পাদক), *কালকথা,* নবনীতা দেব সেন সম্মাননা সংখ্যা ১, নবম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মে ২০১৮
- বিশ্বাস, মৌলিনাথ (সম্পাদক), *কালকথা,* নবনীতা দেব সেন সম্মাননা সংখ্যা ২, নবম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮
- মুখোপাধ্যায়, অতনুশাসন (সম্পাদক), *দশদিশি* , বিষয়-কৃত্তিবাসী রামায়ণ, এপ্রিল ২০১৭
- রায়, শ্রীপর্ণা (সম্পাদক), *অনন্দা,* দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৪২০
- সেনগুপ্ত, সুমন (সম্পাদক), *দেশ,* নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৮৬ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ২ জানুয়ারি ২০১৯

ইংরাজি

- Beauvoir, Simone De, and H. M. Parshley. *The Second Sex*. David Campbell, 1993. Print.
- Bing, Janet. “Is Feminist Humour an Oxymoron?” *Women and Language 27.1* (2004): 22-23. Print.
- Cixous, Hélène, Keith Cohen, and Paula Cohen. "The Laugh of the Medusa." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 1.4 (1976): 875-93. Print.
- Chakraborty,Dilip Kumar,et al.Navaneeta 79.karigor,2007.Print
- Friedan, Betty. *The Feminine Mystique*. Dell, 1972. Print.
- Gilligan, Carol. ‘Letter to Readers, 1993’, in *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1992
- Kumar, Radha. *History of Doing: Women's Movement in India.* Verso, 1993. Print.
- Menon, Nivedita. *Seeing like a Feminist*. Zubaan, 2012. Print.
- Moi, Toril. *Sexual/textual Politics*. Routledge, 2002. Print.
- Richman, Paula. *Questioning Ramayanas: A South-Asian Tradition*. Oxford UP, 2003. Print.
- Sarkar, Tanika. *Words to Win: The Making of a Modern Autobiography*. Zubaan, 2014. Print.
- Sen, Nabaneeta Dev. “Rewriting the Ramayana: Chandrabati and Molla.” *India International Centre Quarterly*, vol. 24, no. 2/3, 1997, pp. 163–177. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/23005443.
- Tandon, Neeru. *Feminism a Paradigm Shift*. Atlantic, 2012. Print.
- Viswamohan, Ayesha. “Urmila: Existential Dilemma and Feminist Concerns.” *Indian Literature*, vol. 45, no. 6 (206), 2001, pp. 184–189. *JSTOR*, www.jstor.org/stable/ 23345768.
- Walters, Margaret. *Feminism: A Very Short Introduction*. Oxford UP, 2005. Print.
- Woolf, Virginia. *A Room of One's Own ; And, Three Guineas*. Penguin Classics, 2019. Print.

সহায়ক গবেষণা নিবন্ধ

- বসু, সঞ্চিতা, *পরশুরামের ছোটগল্প : নির্মাণের শিল্প*, রেজিস্ট্রেশন নং- TH3695, পি.এইচ.ডি (আর্টস), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

বৈদ্যুতিন তথ্য

- http://www.manushi.in/docs/906-when-women-Retell-the-ramayan.pdf (retrived at 20.05.2019, 03: 35 p.m)
- https://glosbe.com/en/en/SAARC%20Decade%20of%20the%20Girl%20Child (retrived at 20.05.2019, 03: 40 p.m)